নেফা-সুন্দরী নেফা



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম (দে'জ) সংস্করণ ঃ
পুনর্যাত্রা, ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যাঁর সাহিত্যপ্রীতির স্মৃতি আমাকে সদাসর্বদা

অনুপ্রাণিত করেছে

আমার সেই পরম পূজনীয়

পিতৃদেব

স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র বসুর

স্মৃতিতর্পণে

নেফাকে ভোলা সহজ নয়। ঘুমের ভেতর নেফা আমাকে হাতছানি দেয়। ডেকে বলে—"ওরে আয়। আমার কোলে ফিরে আয়।" নেফার প্রতি আমি এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি। ইচ্ছে হয় নেফাতে আবার ফিরে যেতে। নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী। সংক্ষেপে নেফা। ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্তের এই ভূখণ্ড এক অদৃশ্য মায়াজালে আমাকে জড়িয়েছিলো। তাকে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নেফার সিয়াং ডিভিসানে পাহাড়ের সানুদেশে সিয়াং নদীর ধারে সমতলভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশিঘাট। ছোট্ট শহর। শহর না বলে গ্রাম বললেই বোধহয় ভালো। নেফার পাশিঘাট আর তার আশেপাশের অঞ্চলের বাসিন্দাগুলো, সবাই এসে মনের দুয়ারে ভিড় জমায়। ওদের ভোলা সম্ভব নয়। ভোলা সম্ভব নয় বিশ্বনাথ নন্দীকে। চক্রবর্তী, ওমি ময়াং, নেনী ময়াং, দেওদার, লুটিং ময়াং, বালু, পোস্ট মাস্টার, পোস্ট মাস্টারের স্ত্রী, মিস্টার ভর্মা, সার্কেল অফিসার, কাগোলী জামু, ওনে ডাই, তরফদার, তালুক তামু, কারছু টাইপোদিয়া, ইবো, সইকিয়া, মিসেস্ চাকলাদার। কাউকে ভোলা সম্ভব নয়। ওরা আমার মনে স্থায়ী আসন পেতেছে। নেফার পাশিঘাটে বেশ কিছুদিন আমাকে থাকতে হয়েছে। সময় কেটেছে নেফার অরণ্যে আর পর্বতে। নেফা আর পাশিঘাটের সঙ্গে বড্ডো জড়িয়ে পড়েছিলাম। পাশিঘাট অন্তরের একটা বেশ বড়ো অংশ জুড়ে নিজের স্থান করে নিয়েছিলো। পাশিঘাট ছেড়ে চলেও এসেছি আজ বেশ কয়েক বছর হলো। জানিনে আজ পাশিঘাটের কতোটা পরিবর্তন হয়েছে। নেফাই বা কতোটা বদলিয়েছে। কতোটা জঙ্গল সাফ হয়েছে তার খোঁজ রাখিনে। রাস্তাঘাট কতোটা বানানো হয়েছে সে খবর কেউ জানায়নি। সারা নেফাতে সার্কেল অফিসার ক'জন এলো আর ক'জন বদলি হল বা পলিটিক্যাল অফিসার আর অ্যাসিস্টেণ্ট পলিটিক্যাল অফিসারদের বদলির খবরের জন্য নেফা গেজেটের পাতা উলটিয়ে দেখিনি। সি পি

ডবলুডির ইঞ্জিনীয়ারদের নেফাতে চাকরির মেয়াদ দু বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করা হলো কিনা সে বিষয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। কামেং-এর বমডিলা আর টোয়াং অঞ্চলে পর্বতশিখরে বরফ জমে। তাতে সূর্যের আলো পড়ে রঙ-বেরঙের সৃষ্টি করে। লোহিত আর টিরাপের অনেক স্থান এখনো বোধ করি জরিপ করা হয়নি। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ আর চীনদেশের সীমান্ত এসে নেফার সঙ্গে মিশেছে। নেফার সীমান্ত অঞ্চলে গভীর অরণ্যে এখনো অনেক কিছু ঘটে যার খোঁজ কেউ রাখে না। টিরাপের গভীর অরণ্যে এখনো কি কাঁচা মাথার লোভে শাণিত তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গফোরা ঘুরে বেড়ায়! লোহিতের জঙ্গলে মাথার ওপর টুপ্ টুপ্ করে জোঁক পড়ে। সুবনসিরির জঙ্গলে নিঃশব্দ চরণে দল বেঁধে ডোরাকাটা বাঘের দল ঘুরে বেড়ায়। কামেং ডিভিসনের উত্তর প্রান্তে বরফের ওপর মানুষের যে অতিকায় পায়ের ছাপ দেখা যায় সেগুলো কি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপ? বরফ গলে বৃহৎ আকার ধারণ করেছে, নাকি সেই অবিশ্বাস্য তুষারমানব? রহস্যময়ী নেফা। বিচিত্র আর অদ্ভুত। আমি ফিরে গিয়ে কি সেভাবে আর নেফাকে দেখতে পাবো? ফিরে পাবো নেফার সে জীবন? জানিনে।

পাশিঘাটের ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ বাংলোতে সে রাতটা এখনো মনের ভেতর বড্ডো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। কাঁদে আর কাঁদে। ডুক্‌রিয়ে ডুক্‌রিয়ে কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। সে কাঁদে এমন করে। আকাশটা থেকে ঝরছে আর ঝরছে। চারদিকে জমাট অন্ধকার। চাপ চাপ কালোর রাশি। আলোর চিহ্ন নেই কোনোদিকে। কালো আর কালো: এরই ভেতর সিয়াং নদী ফুঁসছে। গর্জাচ্ছে। উন্মত্ত একটা জানোয়ারের মতো আছড়াচ্ছে। দাপড়াচ্ছে। দূরে দূরে আকাশছোঁয়া পাহাড়শ্রেণী.

পাহাড়গুলো অন্ধকারের ভেতর যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল। ওদের বুকজুড়ে ঘন অরণ্যানী গভীর, ভীষণ, ভয়ঙ্কর সব অরণ্য। এ নির্জন জনমানবহীন প্রান্তরে কে এমন করে কাঁদে। এ

কান্না যেন কতো যুগ পেরিয়ে, কতো শতাব্দীর অন্তরাল ভেদ করে ভেসে আসছে। উন্মত্ত হাওয়া গর্জনমুখর সিয়াং-এর বুকের ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল বয়ে আসছে। অসহ্য এক গোঙানিতে ভরিয়ে তুলেছে সিয়াং-এর বুক। এ পাগলা ঝড়ো হাওয়া নিষ্ফল আক্রোশে পাশিঘাটের ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলোর গায়ে মাথা কুটে মরছে। সারা বাংলো থরথর করে কাঁপছে। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে যেন। সিয়াং নদী মাটি খেয়ে খেয়ে ধীরে ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। অগ্রসর হচ্ছে একটা রক্তলোলুপ শ্বাপদের মতো। সিয়াং নাকি গত পনেরো দিনে পাশিঘাটের অনেকটা মাটি উদরস্থ করেছে। এর আগে সিয়াং আধখানা পাশিঘাট খেয়ে নিয়েছে। এতো খেয়েও ওর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়নি। বাকী আধখানার ওপর লোভ রয়েছে। সম্পূর্ণ পাশিঘাট উদরস্থ না করে সিয়াং নদী শান্ত হবে না। ওর দয়া নেই, মায়া নেই। ও নির্মম, নিষ্ঠুর! আমি ছাড়া এ ভয়ঙ্কর রাতে, এ জনমানবহীন প্রান্তরে, এ নির্জন বাংলোতে আর কেউ নেই। দু-চার মাইলের ভেতর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। বাংলোর চৌকিদার পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে চলে গেছে।

কোথায় গেছে কে জানে। আমাকে নির্মম এক নির্জনতা, দুরন্ত অশান্ত হাওয়া আর উন্মত্ত সিয়াং এর কাছে সঁপে দিয়ে চলে গেছে। আমার জন্যে রেখে গেছে একঘেয়ে, বিরক্তিকর করুণ আর প্রাণ-কাঁপানো এক কান্না। হঠাৎ টক্‌ টক্‌ টক্‌! দরজায় করাঘাত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় হাওয়া। আবার শব্দ হয় টক্‌ টক্‌ টক্‌! না বেশ পরিষ্কার,—"কে? কে?" প্রশ্ন করি। কোনো সাড়া নেই। আবার চেঁচিয়ে বলি—"ওখানে কে? কে ওখানে?" কেউ সাড়া দেয় না। শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু উন্মত্ত হাওয়া মাইলের পর মাইল ছুটে এসে ধাক্কা দিচ্ছে ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলোর গায়ে। হ্যারিকেনটা একরাশ কালো ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করছে। আবার। আবার সেই শব্দ। হ্যারিকেনটা নিয়ে এগিয়ে চলি। এগিয়ে যাই অনেক সাহস

সঞ্চয় করে। জানলার ছিটকিনি নীচে নামিয়ে জানলার একটা পাট খুলে দিই। মরচে পড়া লোহা আর পুরনো কাঠ ককিয়ে কেঁদে ওঠে। জানলার গরাদ নেই। হ্যারিকেনটা নীচে বারান্দায় নামিয়ে দিই। বড্ডো দুর্বল আলো। মুহূর্তে জমাট অন্ধকার এসে আলোটুকু গ্রাস করে নেয়। তবু ওই টিমটিমে আলোতে যতোটুকু দেখবার দেখে নিতে চেষ্টা করি। হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরি। না, কেউ নেই চারিদিকে। কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না।—"কেউ আছো ওখানে?" হিন্দীতে বলি। কেউ সাড়া দেয় না। নিষ্ফল চেষ্টা। দমকা হাওয়া এসে আলোটা নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আমি যে স্পষ্ট দরজায় করাঘাত শুনেছি। হ্যারিকেনটা ভেতরে নিয়ে এসে জানলাটা বন্ধ করে দিই। বিছানায় এসে বসেছিলাম। আবার শুরু হয় সেই ডুকরিয়ে কান্না। একঘেয়ে বিরক্তিকর কান্না। খানিকক্ষণের জন্য কান্না বন্ধ ছিলো। আবার শুরু হয়েছে! এ অন্ধকারে গিয়ে কান্নার উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি মাত্র আজ দুপুরবেলা এসে পাশিঘাটে পৌঁচেছি। এখানকার সব কিছু আমার কাছে অজানা। কিন্তু ক্রমবর্ধমান হাওয়ার করুণ কাতরানি আর সিয়াং-এর গর্জন, কান্নাকেও ডুবিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবি এ দমবন্ধ করা নির্জনতা, মিয়াং-এর গর্জন, আর মানুষের চাপা কান্নার ভেতর কি কেউ ঘুমোতে পারে? এখানে রাত্রিবেলা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দরজায় করাঘাত হয়। যে করাঘাত করে সে সাড়া দেয় না। ভাবি দূর ছাই, নেফাতে চাকরি না নিয়ে এলেই ভালো ছিলো। সিয়াং ডিভিসনের পাশিঘাটের স্কুল মাস্টারের এ চাকরির অফার গ্রহণ না করলেই ভালো ছিলো। দেশ ছেড়ে নেফার এতো অভ্যন্তরে না এলেই ভালো ছিলো। নেফার কামেং নয়। সুবনসিরি নয়। একেবারে সিয়াং ডিভিসনে। আমি ভাবি নেফার মায়ায় জড়ালাম কেন? মাইনেটা অবশ্য স্কুল মাস্টারের পক্ষে লোভনীয়। ইনার লাইন। পাস, পারমিট ছাড়া নেফাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেক সুযোগ-সুবিধে। থারটিথ্রী এ্যাণ্ড ওয়ান থার্ড এ্যালাউয়েন্স। ফ্রি হাউস, ফ্রি মেডিক্যাল

ট্রিট্‌মেণ্ট। রান্না করবার লোক। তাকে আমার পকেট থেকে মাইনে দিতে হবে না। ট্যুরে গেলে ডবল ভাতা। আরো অনেক রকম সুযোগ সুবিধে ছিলো। মনে মনে ভাবি এখানে আসা কি শুধু টাকা আর সুখের জন্য! নেফার আকর্ষণ কি কিছুই ছিলো না! এ্যাডভেঞ্চার? নূতনকে জানবার আগ্রহ? এ সব কিছুই নয়? স্ত্রী নেই। পুত্র, কন্যা কিছুই নেই। আমার অসুবিধে কিসের। জীবনে একটা মস্ত সুযোগ। ভাবলাম ঘুরে আসি নেফা। কিন্তু এ ইন্‌স্‌পেকসন্‌ বাংলোতে না উঠলেই বোধ করি ভালো ছিলো। আশেপাশে কারা যেন সব ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথাবার্তা বলছে। কান পেতে শুনি। শোনার ভুল না তো! না সত্যি। ফিস্‌ ফিস্‌ করে কারা যেন সব কথাবার্তা বলছে। না। কেউ কথা কইছে না। এ হাওয়ার কারসাজি। হাওয়াতেই এসব করছে। দরজায় করাঘাত নয়। ইন্‌স্‌পেক্‌-সন্‌ বাংলোর দরজা-জানলার সঙ্গে হাওয়ার এ এক গোপন ষড়যন্ত্র।

* *

বিশ্বনাথ নন্দী পাশিঘাট হাসপাতালের ডাক্তার। সদাহাস্যময়। প্রাণখোলা, দিলদরিয়া মানুষ এ বিশ্বনাথ নন্দী। মানুষকে আপন করে নিতে তার দুদণ্ড সময়ও লাগে না। ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলোতে আমি রয়েছি জেনে সন্ধ্যেবেলা নন্দী চলে এসেছে আমার খোঁজখবর নিতে। এসেছে সন্ধ্যের একটু পরেই।—"এসে গেলুম স্যার আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে।"

হাতের ছাতা আর রেইনকোট নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে বিশ্বনাথ নন্দী।

—"বসুন। বসুন।" চেয়ারটা এগিয়ে দেবার ফাঁকে একঝলক লোকটাকে দেখে নিই। মাথায় বেঁটে। শক্ত আর জোয়ান লোকটা। চওড়া কপাল। প্রশস্ত বুক। হাতে বুকে প্রচুর লোম নিয়ে লোমশ পুরুষ। ব্যাকব্রাশ করা চুল। কয়লা-কালো গায়ের রং। প্রকৃতি ভেজাল দেবার চেষ্টা করেনি। চলাফেরার ভেতর শরীরের ওজন

পরিস্ফুট।—"আমার পরিচয়টা জানতে চাইছেন তো?" কিছু বলবার আগেই সে বলে—"আমার নাম ডক্টর বিশ্বনাথ নন্দী। পাশিঘাট হাসপাতালের ডাক্তার। কারণ অকারণে রোগী মেরে ফেলি বলে আমাকে কেউ বদনাম দেবে না।" বলেই নন্দীমশায় হা হা করে হেসে ওঠে। হাসি নয় যেন সমস্ত ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ বাংলোটা কাঁপিয়ে ছাড়ে।—"সমস্ত পাশিঘাটের খোঁজখবর নেওয়া আমার কাজ। তাই আমাকে সবাই পাশিঘাটের গেজেট বলে। ডিভিসনাল ইন্‌স্‌পেক্‌টারের কছে শুনেছিলাম আপনার পাশিঘাট স্কুলে চাকরি হয়েছে। আর পাশিঘাটে আপনার উপস্থিতি ঘোষণা করেছে আমাদের চক্রবর্তী। পলিটিক্যাল্ অফিসের হেডক্লার্ক। আপনার এখানে পৌঁছুবার খবর পেয়ে ভাবলাম যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের পর্বটা সেরে আসি।" নেভানো চুরুটটা বিশ্বনাথ দাঁতে জোরে চেপে ধরে ফস্ করে কাঠিটা ধরিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে।

—"এসে খুব ভালো কাজ করেছেন। তা জায়গাটা কেমন লাগছে?" প্রশ্ন করে বিশ্বনাথ নন্দী।

—"আজ দুপুরবেলা এখানে এসে পৌঁচেছি। এর ভেতর মন্তব্য পেশ করা উচিত নয়। তবে এখানে পৌঁছেই বুঝতে পারছি কি ভীষণ নির্জনতার মধ্যে এসে পড়েছি। এ নির্জন পরিবেশ বড্ডো অস্বস্তিকর।"

—"পাশিঘাটকে নির্জন বলছেন! নেফার অভ্যন্তরে যাননি এখনো। গেলে বুঝতেন। যদি যেতেন কামেং ডিভিসনের টোয়াং অঞ্চলে, সুবনসিরির ডাপরাজিও সিয়াং-এর টুটিং অঞ্চল ছাড়িয়ে, আরো উত্তরে আর লোহিতে ওয়ালাং-এর পথে। টিরাপ আর ব্রহ্ম সীমান্তে গেলে বুঝতেন অরণ্য আর নির্জনতা কি ভীষণ বস্তু! নির্জনতা সম্বন্ধে ভেবেছেন কি মরেছেন। স্রেফ চোখ, নাক, কান বুজে কাজকর্ম করে যাবেন। হবিটবি আছে নাকি কিছু?"

—"না, তেমন কিছু নেই।"

—"থাকলে ভালো ছিলো। সময় কাটতো।" বলে নন্দী।

—"আপনার কিছু হবি আছে নাকি ?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

—"আলবৎ আছে। নাটক মঞ্চস্থ করবার বড্ডো শখ মশাই। পাশিঘাটে তেমন সুযোগ-সুবিধে কোথায়। তবে পাশিঘাটে বৎসরে একটা কি দুটো নাটকের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। সংসার পেতেছেন ?"

—"না।"

—"ব্যাচেলার ! খুব ভালো। ঠিক আমার মতো। এখানে সঙ্গী, ক্লাব, আড্ডা এবং হবিটবি ছাড়া দিন কাটানো অসম্ভব। আর আমি ওসব নিয়েই বেঁচে আছি। সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই। দোকান-পত্তর নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব ভালো নয়। নেফার অভ্যন্তরে গেলে অরণ্যের ভেতর সরু সরু পায়েচলা পথ। পাশিঘাটে সন্ধ্যের পর পথেঘাটে লোকের দেখা মেলা দুষ্কর। অরণ্য আর অরণ্য। এপ্রিল মাস থেকে বর্ষা শুরু হয়। চলে সেই অক্টোবর মাস পর্যন্ত। একনাগাড়ে বিশ-বাইশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি পড়তে থাকে। সাধারণতঃ পাশিঘাটে প্লেন নামে সাতদিনে একদিন। বর্ষার সময় দু'তিন সপ্তাহেও প্লেন নামতে পারে না। ও-সময়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। ব্রহ্মপুত্র-তীরে ওইরামঘাট অনেক দূরের পথ। অরণ্যে ঢাকা পার্বত্য পথে পৌঁছতে অনেক কষ্ট। অনেক পরিশ্রম। নেফাতে বৃষ্টিপাতের পর সমস্ত জল নেমে যায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে। তখন ব্রহ্মপুত্রের কি রূপ ! বাপ্ ! অসংখ্য গাছের গুঁড়ি ভেসে চলে তীব্রগতিতে। নৌকো সামনে পড়লে দুফাঁক করে ছেড়ে দেয়।"

—"এরকম ঝড়জল মাথায় করে জলকাদা ভেঙ্গে জঙ্গলা রাস্তায় অন্ধকারের ভিতর চলে এলেন ! একটা টর্চও সঙ্গে দেখছিনে। ভয় করলো না ?" প্রশ্ন করি আমি।

—"অভ্যেস হয়ে গেছে। ভয়টয় চলে গেছে। টর্চটা রেন্-কোটের পকেটে রয়েছে। বের করবার কথা মনে হয়নি। অন্ধকারে পা চালিয়ে দিয়েছি।" বিশ্বনাথ নন্দীর চুরুটের আগুন নিভে গেছে।

চুরুটে আবার সে অগ্নিসংযোগ করবার চেষ্টা করছে। সিয়াং নদীর ওপর দিয়ে উন্মত্ত হাওয়া বয়ে চলেছে। শব্দ হচ্ছে সোঁ সোঁ করে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছে ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলোর গায়ে। সারা আকাশে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মনে হয় সারা আকাশে জ্বলন্ত একঝাঁক সাপ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

—"এখানে থাকলে ভয় আপনারও চলে যাবে।" বলে বিশ্বনাথ নন্দী।

—"সাপটাপ কেমন?" প্রশ্ন করি।

—"প্রচুর। যারা আছে তাদের কামড়ে নাকি লোক ঘণ্টাখানেকও টেঁকে না।"

—"সর্বনাশ!"

—"এখানকার জোঁক সাংঘাতিক। বলতে পারেন বিশ্ববিখ্যাত। গাছের পাতা থেকে টুপ্‌টুপ্‌ করে মাথার ওপর জোঁক পড়ে। বর্ষার সময় সবাই বলে ঘাসের ডগা গোনা যায়। কিন্তু জোঁক গুনে শেষ করা যায় না। সংখ্যায় তারা অগণিত, অসংখ্য। মানুষের বা জন্তুজানোয়ারের গন্ধে ওরা পাগলের মত হয়ে যায়। কোমর পর্যন্ত শরীরটা উঁচু করে তুলে ধরে শিকার দেখে নেয়। তারপর লাফিয়ে ছোটে রক্তের সন্ধানে।"

—"তা সত্ত্বেও জলকাদা ভেঙ্গে এরকমভাবে এলেন, টর্চটা জ্বালাতে পর্যন্ত ভুলে গেলেন!"

—"ভালো কথা বলেছেন। সারকিট্‌ হাউসের পেছনে আর এডুকেশন্‌ কলোনির সামনের জংলা রাস্তাটা ধরে এসেছি। খানা-ডোবা ওখানে কম ছিলো না। দেখি ক'টা জোঁক ধরলো আমাকে।" বিশ্বনাথ নন্দী প্যান্টের কাপড় খানিকটা গুটিয়ে বিরাট মাস্‌ল-পুষ্ট পাখানা চেয়ারের ওপর মেলে ধরে।

"পায়ের মাস্‌ল দেখছেন? গোলের সামনাসামনি পায়ে বল পড়লে গোলকীপার কাঁপতো?" পা দুখানা আলোর সামনে ধরতেই

দেখা যায় বেশ কয়েকটা জোঁক পায়ের মাংস থেকে ঝুলছে। রক্ত খেয়ে দিব্যি পুষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি শিউরে উঠি।—"করেছেন কি মশাই! এতো রক্ত চুষে খেয়ে নিলো টের পেলেন না? টেনে ফেলে দিন একটা একটা করে!" আমার শরীরটা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে। হাসে নন্দী।

—"ওর দাওয়াই রয়েছে সঙ্গে।" বিশ্বনাথ নন্দী দু-পকেট থেকে দুটো পুরিয়া বের করে।

—"একটাতে রয়েছে নুন। আরেকটাতে তামাকপাতা। দুটোই জোঁকের যম।" নন্দীমশাই ততক্ষণে দুটো মোক্ষম অস্ত্র জোঁকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন আলগা করে মাটির ওপর টুপ্‌টুপ্ করে পড়তে শুরু করেছে। ওদের শরীরের ওপর নুন ঢালতে শুরু করেছে নন্দীমশাই। আর সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করছে ওদের শারীরিক যন্ত্রণা।

—"সব কিছু দেখতে হলে আপনাকে নেফার অভ্যন্তরে ঢুকতে হবে।"

—"আমাকে বোধ করি বছরখানেক বছর দেড়েকের জন্যে পাশিঘাট ছেড়ে বেরুতে হবে না। মানে বদলি হবো না বলেই ভাবছি।"

—"সে কি মশাই! আপনার জন্যে ধাপে ধাপে প্রমোশন্ সাজানো রয়েছে। অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার। হেডমাস্টার। ডিভিসনাল্ ইন্‌স্পেক্টার। তারপর ডিভিসনাল্ ইন্‌স্পেক্টার। অল্প বয়স। লেখাপড়া জানা ছেলে। সামনে আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।"

—"না না, অতোশতো ভাবিনে আমি।"

—"আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। নেফা সার্ভিসে প্রমোশন্ বড্ডো কুইক্। তবে সারাটা নেফা চষে বেড়াতে হবে। এ আপনার প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস্ বা সেণ্টারের চাকরি নয়। নেফার চাকরির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহজে লোক পাওয়া যায় না। সেণ্টার আর প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক সহজে এখানে আসতে চায় না। এখানে

বদলির কথা শুনলে লোক আঁতকে ওঠে। তাই এখানে মাইনে আর এ্যালাউয়েন্স্ নিয়ে অনেক টাকা। সুখসুবিধে অনেক।"

—"নেফাতে রোগ কিরকম রয়েছে?"

—"সব রোগই রয়েছে। কলেরা, পেটের নানারকম রোগ, বসন্ত, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, আমাশা টি, বি আর গলগণ্ড।"

—"টি, বি কেন?"

—"পাহাড়ী পথে প্রচুর ওঠানামা করতে হয়। ভারী ভারী মাল মাথায় নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। খাওয়াদাওয়া ঠিকমত হয় না। তাছাড়া পার্বত্য জাতিগুলো দুধ খাবে না।"

—"কেন?"

—"ওরা বলে ওটা গরুর পাস্। তাই খায় না। তবে আজকাল যারা লেখাপড়া শিখছে, পাঁচটা জানছে শুনছে, তারা খাচ্ছে। নিয়মকানুন ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে।"

—"গলগণ্ড রোগও রয়েছে?" আমি প্রশ্ন করি।

—"পাশিঘাটে আর তার আশেপাশে ও রোগের খুব আধিক্য রয়েছে। জলে আয়োডিনের অভাব। চৌকিদারকে ডাকুন না। এক কাপ চা না হলে গল্প জমছে না।"

—"চৌকিদার খাবার ঢাকা দিয়ে অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। আপনাকে চা না দিতে পেরে বড্ডো লজ্জিত বোধ করছি। বাড়িঘর হলে প্রত্যেক সন্ধ্যায় আপনাকে চা অফার করবো কথা বলে দিচ্ছি।"

—"গুড্। লজ্জিত হবার কিছু নেই। চৌকিদারের কে এক নিকটআত্মীয় হাসপাতালে রয়েছে। চৌকিদার তার কাছে গেছে। রাতের বেলা কাছে থাকবে। সীটের বন্দোবস্ত আমাকেই করতে হয়েছে। ওদের কি আর সহজে হাসপাতালে ভর্তি করা যায়! নিজেদের দাওয়াই খেয়ে ওরা নিশ্চিন্ত আর সঙ্গে সঙ্গে নানারকম পুজো-পার্বণ। ভূত, প্রেত, পাহাড়, জঙ্গল সবাইকে ওরা পুজো করে। মিথোন নামে মহিষের মতো দেখতে জানোয়ার মেরে দেবতা আর

অপদেবতার কাছে উৎসর্গ করে।”

—“কতরকমের পূজো-পার্বণ এখানে রয়েছে ?”

—“এ অঞ্চলের কতগুলো পূজো-পার্বণের কথা বলছি। পুঁইমে বা সাপ পূজো। বছরের প্রথমে হয়। লোকেরা পূজোর দিন ঘরের বাইরে যায় না। পাছে সাপ কামড়ায়। তারপর রয়েছে টাপু পূজো। এ পূজো করলে মানুষের সংখ্যা নাকি বাড়ে।

“বিভিন্ন ট্রাইবস্‌দের লোকসংখ্যা খুব কম। অনেক ট্রাইবস্‌-এর প্রায় লোপ পাবার অবস্থা। সুতরাং এ পূজোর ওপর তাদের খুব ঝোঁক। আর রয়েছে চলোং পূজো। জুলাই মাসে হয়। গরীবদের ধনী লোকেরা খেতে পরতে দেয়। মাঘ মাসে আরাণ পূজো। ওদের বিশ্বাস মৃত আত্মীয়স্বজনের আত্মা পূজোর আগের দিন ঘরে ঢুকে থাকে। তাদের উদ্দেশ্যে ঘরের চালে মদ মাংস টাঙিয়ে রাখা হয়।”

—“আচ্ছা। এখানে অনেক ট্রাইবস্‌ রয়েছে, তাই না ?” আমি প্রশ্ন করি।

—“অনেক। অনেক। মোটামুটি কয়েকটির কথা বলছি। কামেং ডিভিসানে মন্‌পাস্‌, আকাস্‌, সেরদুক্‌পেনস্‌ আর মিকিস্‌। সুবনসিরি অঞ্চলে ডফ্‌লাস্‌। আপাটানঙস্‌। সিয়াং-এ পদম্‌স্‌, পাশিস্‌, পাঙ্গিস্‌, মিনিয়ঙস্‌ আর গালঙস্‌। লোহিতে খাম্‌টিস্‌ আর মিস্‌মীস্‌। টিরাপে সিঙফোস্‌, নক্টেস্‌, ওয়াংচোস্‌ আর ট্যাংছাস্‌।

“মাত্র অল্প কয়েকটা ট্রাইবের কথা বললাম। এছাড়া আরো অনেক রয়েছে। ধীরে ধীরে সব জানতে পারবেন।”

—“নেফা যে এতো বৃহৎ তা ধারণা ছিলো না !”

—“নেফার আয়তন ৩০,০০০ বর্গমাইল। এর পশ্চিমে ভুটান। উত্তর ও উত্তর-পূর্বে তিব্বত আর চীন। দক্ষিণ-পূর্বে ব্রহ্মদেশ। নেফার জঙ্গলে সেদিন পর্যন্ত চলেছে দাস-ব্যবসা। নরমুণ্ড অন্বেষণ। এক ট্রাইব অতর্কিতে আক্রমণ করে অন্য ট্রাইবকে নিশ্চিহ্ন করেছে। মানুষ চুরি, আফিং-এর চোরাকারবার চলেছে। তবে স্বাধীনতা পাবার পর

অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। রাতের বেলা আপনার ভয়টয় করবে না তো?"

—"না না।" অনেক সাহস সঞ্চয় করে বলি।

—"সিয়াং-এর মতিগতি কিন্তু ভালো নয়। সিয়াং আধখানা পাশিঘাট খেয়েছে আর আধখানার ওপর ওর লোভ রয়েছে। ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ বাংলো যে-কোনো দিন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

—"বলছেন কি?"

—"হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। তবে পলিটিক্যাল অফিসের লোকেরা চোখ নাক কান খোলা রেখেছে। সিয়াং-এর মতিগতি খারাপ দেখলেই সারা পাশিঘাটের লোকদের সতর্ক করে দেবে। আপনিও চোখ নাক কান খোলা রেখে ঘুমুবেন।" বলে বিশ্বনাথ নন্দী।

—"চোখ কান খোলা রেখে কি কেউ ঘুমুতে পারে?"

—"খুব পারে। পারা যায় মশাই, পারা যায়। জানেন তো সিয়াং বড্ডো অবুঝ। আচ্ছা গুড নাইট।" নন্দীমশাই অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। সে রাত্তিরে এসব ছাড়াও ডাক্তার নন্দী একটা ভূতুড়ে কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলো। ওই নির্জন বাংলোতে ওই পরিস্থিতির ভেতর ও কাহিনী না বললেই ভালো ছিলো। ডাক্তার নন্দী তখন প্রথম পাশিঘাটে এসেছে। একটু বেশী রাতে কল্ পেয়ে সে রোগী দেখতে গিয়েছিলো। ইন্‌সপেক্‌সন্ বাংলোর আশেপাশে তখন গভীর অরণ্য। দুর্ভেদ্য জঙ্গল সাফ করে মাঝে মাঝে পদমদের ঘর। পাশিঘাটের ক্রাফট্ সেণ্টারকে ডানহাতে রেখে। ইন্‌সপেক্‌সন্ বাংলোর দিকে না গিয়ে ডাক্তার গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রের পথে এগিয়ে-ছিলো। বালি ময়াং নাকি খুব অসুস্থ। বাঁচবার আশা নেই। তাকে দেখতে যাবার জন্যে বালি ময়াং-এর ঘর থেকে ডাক্তারের কাছে লোক এসেছিলো। বালি ময়াং ও অঞ্চলে নামজাদা ডাকসাইটে লোক। না গেলে নয়। ডাক্তার লোকটাকে বিদায় দিয়েছিলো। ওর সাহায্য ছাড়াই ডাক্তার নন্দী এদিকে এসেছিলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে সে

বুঝতে পারলো যে জংলা রাস্তায় সে পথ হারিয়েছে। ডাক্তার নন্দী ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে। ভয়ডর বলে তার কিছু জানাই ছিলো না। সাহসে ভর করে সে এগিয়েছে। কোমরে তার বিরাট ছুরি। হাতে টর্চ। ভয়টা কিসের? হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে। আশেপাশে বাড়িঘরের চিহ্ন বা আলোর চিহ্ন নেই। মেয়েটা অন্ধকারের ভেতর এসময়ে কোথা থেকে বেরিয়ে এলো? ভাবে ডাক্তার নন্দী। আশেপাশে ঘরদোর বা আলোর চিহ্নটুকু দেখতে পাচ্ছে না ডাক্তার নন্দী। মেয়েটি কথাবার্তা বলে না। তার পিছু পিছু যাবার জন্যে সে ডাক্তারকে ইঙ্গিত করে। ডাক্তার এগোয় না।—"বালি ময়াং-এর ঘর চেনো?" জিজ্ঞেস করে ডাক্তার। মেয়েটা উত্তর দেয় না। ডাক্তার আবার তাকে বালি ময়াং-এর ঘর-এর কথা জিজ্ঞেস করে। মেয়েটা উত্তর দেয় না। হাতের আঙুল তুলে ওর পিছু পিছু এগোবার জন্যে ডাক্তারকে ইঙ্গিত করে। উপায় নেই। পথঘাট সম্পূর্ণ অচেনা। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চের আলোতে যেটুকু দেখা যায়।

ডাক্তার বাধ্য হয়ে ওকে অনুসরণ করে। ওর পিছু পিছু চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত যে ঘরে ডাক্তার পৌঁচেছিলো সেটা বালি ময়াং-এর ঘর নয়। তবে অন্য এক রোগিনীর চিকিৎসে ডাক্তারকে করতে হয়। নাড়ী টিপতে গিয়ে ডাক্তার চম্‌কে ওঠে। এতো ঠাণ্ডা হাত! রোগিনীর মুখ দেখার উপায় নেই। ডাক্তার নাড়ী টিপে প্রেস্‌ক্রিপশান্‌ লিখে চলে এসেছে। মেয়েটা সারাটা রাস্তা পথ দেখিয়ে এনেছে। ক্রাফট্‌ সেণ্টারের কাছাকাছি এসে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে সে মিলিয়ে যায়। চারধারে টর্চের আলো ফেলে ডাক্তার তার কোনো হদিস করতে পারে না। এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিলো। ডাক্তার পথ হারিয়ে ছিলো। এক রোগীর বদলে অন্য এক রোগিনী দেখে এসেছে। তাতেও বলবার কিছু ছিলো না। কিন্তু মুস্কিল হল তখুনি যখন দিন দুয়েক পরে নেহাৎ কৌতূহল মেটাবার উদ্দেশ্যে ডাক্তার দিনের বেলা রোগিনীর খোঁজ করতে গিয়েছিলো।

ডাক্তারের সঙ্গে তুজন পদম ছিলো। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেও রোগিনীর ঘরের সন্ধান করতে পারেনি। রোগিনীর পাত্তা মেলেনি। ও অঞ্চলে কেউ অসুস্থ হয়েছে এ খবরটুকু পর্যন্ত পদম তুজনের জানা ছিলো না। ডাক্তার আন্দাজ করে তাদের যে জায়গায় নিয়ে এসেছিলো সেখানে কোনোদিনই কোনো বসতি ছিলো না। সেখানে ছিলো গভীর অরণ্য। ডাক্তার যখন ওদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলেছে, যুক্তিজালের কঠিন বাঁধনে ওদের বাঁধবার চেষ্টা করছে ঠিক তখুনি একটা গাছের নীচে ডাক্তারের লেখা প্রেস্‌ক্রিপশান্‌টা পাওয়া যায়। প্রেস্‌ক্রিপশান্‌ রয়েছে অথচ রোগিনী নিখোঁজ! ঘরবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ডাক্তার নন্দী ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলো চলে যাবার আগে বলেছিলো —"সে পথ যে দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো নিশ্চয়ই নেনী ময়াং।" নেনী ময়াং সম্বন্ধে সে মুহূর্তে কিছু জানবার আগেই ডাক্তার অদৃশ্য হয়েছে। পরে অবশ্যি অনেক কিছু জেনেছিলাম।

॥ তুই ॥

এই মুহূর্তে যার কথা বার বার মনে হচ্ছে সে হল লুটিং ময়াং। লুটিং ময়াংকে ভোলা সম্ভব নয়। ভোলা সম্ভব নয় বোলেং-এর সেই রাতটা। বোলেং-এর বাঁশের ঘরে সন্ধ্যেটা কেমন যেন থমথমে। পাশিঘাট থেকে রেঙ্গিন। রেঙ্গিন থেকে রটুং, রটুং থেকে ইয়ামবুং, ইয়ামবুং থেকে পাঙ্গিন্‌, আর পাঙ্গিন্‌ থেকে বোলেং। অরণ্য আর অরণ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়। পার্বত্য স্রোতস্বিনীগুলোতে কি অসম্ভব স্রোত। শিবকরণ, সিলে, সিরকি, লিম্বুকরণ আর তুরাকরণ—তাছাড়া আরো অসংখ্য নদী! নদীগুলোর তুধারে পাথর আর নুড়িতে বোঝাই। নদীগুলোর ওপরে তুলছে বাঁশ আর বেতের সব সেতু। তুলছে আর তুলছে। তু-তীরের বিরাট বিরাট গাছের সঙ্গে দড়ি আর বেত দিয়ে সেতুগুলোকে বাঁধা হয়েছে। দড়ির বাঁধন খুলে গেলে, বেত খুলে গেলে, মানুষসুদ্ধ সেতুগুলো নেমে যায় স্রোতস্বিনীর বুকে। তারপর কোথায় মিলিয়ে

যায়, হারিয়ে যায়, কেউ জানে না। সন্ধ্যের অন্ধকার নামবার আগে লিম্বুকরণ আর তুরাকরণের জলে ডোরাকাটা বাঘের দল এসে মুখ ডোবায়। জল পান করে আর এদিক্ ওদিক্ লুব্ধ দৃষ্টি ফেলে শিকার খোঁজে। ওদের পেছনে ফেউ ঘোরে। ওরা জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীদের সাবধান করে দেয়। এক-একটা হাতীর দল জঙ্গলের গাছ আর ডাল-পালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জলের সন্ধানে স্রোতস্বিনীর দিকে এগিয়ে আসে। তারা শুঁড় তুলে আকাশের দিকে ধুলো ছুঁড়ে চারদিক অন্ধকার করে ফেলে। বন্য গাছগাছড়া, লতাপাতা আর শিকড় খায়। বিরাট মাথা আর সাংঘাতিক চওড়া কপালের ধাক্কা দিয়ে গাছগুলোকে মাটিতে শুইয়ে দেয়। শুঁড়ে জল নিয়ে ফোয়ারার সৃষ্টি করে। বিরাট বিরাট কানগুলো ঘন ঘন আন্দোলিত করে। তাদের হুঙ্কারে বনভূমি কেঁপে ওঠে। ছোটো ছোটো প্রাণীরা ভয়ে দিশাহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালায়। হরিণের এক-একটা বিরাট দল কান খাড়া করে কি যেন শোনে তার পর উল্টোদিকে দৌড়োতে শুরু করে। বানর আর হনুমানগুলো এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফঝাঁপ শুরু করে দেয়। কিচিরমিচির করে বিপদ ঘোষণা করে। সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার নেমে আসে রেঙ্গিন, রটুং, ইয়ামবুং, পাঙ্গিন্ আর বোলেং-এর অরণ্যে। পাহাড়গুলোকে ঠিক যমদূতের মতো দেখায়। বাঁশের ঘরের ভেতর সি পি ডব্লুডির ইঞ্জিনীয়ার বালু গম্ভীর মুখ করে বসে আছে। টানছে একটার পর একটা সিগারেট। পাশে লুটিং ময়াং-এর মুখে চিন্তার ঘন কালো ছায়া। একটা টিলার ওপর বাঁশের ঘরটা। বাঁশ আর বেতের তৈরী ঘরের ভেতর অসংখ্য ছিদ্র-পথে প্রচুর হাওয়া বয়ে এসে হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দিতে চায়। বাঁশের তৈরী ঘরগুলোকে ওখানে "বাসা" বলে। বালু ওই বাঁশের ঘরে একলা থাকে। এ অরণ্যে বালু রাস্তা বানাচ্ছে। প্রথমে পায়ে চলার রাস্তা। তারপর জীপ চলার রাস্তা। ধীরে ধীরে রাস্তা চওড়া করতে হবে। চওড়া করতে হবে ট্রাক্ আর বড়ো বড়ো গাড়ী চলাচলের জন্য। বড্ডো পরিশ্রম। কঠিন মেহনত। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ওড়াতে ওড়াতে

বেতের খাপের ভেতর ঝকঝকে দা ঝুলছে। সে মাথায় ভালুকের চামড়ার তৈরী টুপী পরেছে। বোলেং-এর অরণ্যে বিরাট ভালুকটার সঙ্গে একলা ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ করবার পর সে ওটাকে মেরেছিলো। ভালুকটা লুটিং-এর একটা চোখ নখ দিয়ে উপড়ে নিয়েছিলো। লুটিং-এর তাই সম্বল মাত্র একটা চোখ। সে চোখটা আবার রক্তবর্ণ। প্রচুর আপঙ (স্থানীয় মদ) পান করার ফলে এ অবস্থা। তার কানে বিরাট বিরাট ছুটো গর্ত। আর সে গর্তে জীবজন্তুর হাড়ের তৈরী গয়না গোঁজা রয়েছে। দাড়ি-গোঁফে আচ্ছাদিত দৈত্যের মতো দেখতে লুটিংকে দেখলে ভয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে। বোলেং-এর অরণ্যে রাতের বেলা লুটিংকে দেখে ভয়ে আমি বার বার কেঁপে উঠেছিলাম।

ইয়াম্ বুং থেকে তার পোষা মেয়ে হাতীটা পালিয়েছে। পালিয়েছে কয়েকটা জংলা মদ্দা হাতীর সঙ্গে। তার পোষা শান্ত হাতীটা একদল বন্য হাতীর সঙ্গে চলে গেছে। লুটিং ময়াং-এর কতো আদরের ছিলো এ হাতীটা। এতোটুকুন একটা বাচ্চা থেকে ওকে সে এতো বড়ো করেছিলো। নিজের হাতে লুটিং ওকে খাওয়াতো। কলাগাছ, গাছের ডাল, আখ, বাঁশ আর বাঁশপাতা লুটিং-এর হাত থেকে খেতে খেতে হাতীটার চোখ আনন্দে বুজে আসতো। ইয়াম্ বুং-এর জঙ্গলে বাচ্চা হাতীটা মা বাপ হারিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিলো। লুটিং দেখতে পায় আর দেখতে পেয়ে ওকে নিয়ে এসেছিলো। তারপর কত আদর যত্নে ওকে লুটিং বড়ো করে তুলেছে। লুটিং-এর চারটে বউ। কমিং ময়াং, ওপেট্ ময়াং, লোলিং ময়াং আর ছোটো বউটার নাম ওনে ডাই। হাতীটাকে আদর-যত্ন করতে গিয়ে সে প্রচুর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। চারটে বউ-এর কাছ থেকে সে অনেক বাধা পেয়েছে। হিংসেতে ওরা জ্বলে মরতো। বিশেষ করে ছোটো বউটা বড্ডো বিগড়াতো। রাগে, অভিমানে ছোটো বউটা মাঝে মাঝে খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করতো। লুটিং তাকে একটু আদর করতে চাইলে হাতের কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বউটা পালিয়ে যেতো। লুটিংকে হাতীটার

গলা জড়াতে দেখলে ওনে ডাই ঘরে গিয়ে খিল দিতো। জঙ্গলে হাতীটাকে নিয়ে রাত কাটালে ছোটো বউটা পালিয়েছে পর্যন্ত। চলে গেছে চৌখাম্ আর ডাম্বুক গ্রামে। ভাই আর মামার বাড়িতে। একবার মজা দেখবার জন্যে লুটিং একটা বিয়ের বন্দোবস্ত করলে। হাতীটার সঙ্গে তার বিয়ে। এমনি একটা স্ফূর্তি আর কি! খানিকটা মজা। পুরোহিত এনেছিলো লুটিং। প্রচুর ধূমধাম করেছিলো। মিথোন কেটেছিলো। অনেকগুলো শুয়োর কেটেছিলো। পানীয় হিসাবে প্রচুর আপঙ্-এর ব্যবস্থা করেছিলো। হাতীটাকে ভালো করে স্নান করিয়েছিলো। ফুলের মালা পরিয়েছিলো। ডিমের সঙ্গে আদা গুলে তা আপঙ্-এর সঙ্গে মিশিয়ে ঘরের চালে লট্‌কিয়ে দিয়েছিলো। মৃত আত্মীয়স্বজনের আত্মারা এসে খাবে এবং খেয়ে তৃপ্ত হবে। ধূমধাম সে মন্দ করেনি। দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসেছিলো আনন্দ করতে। মজা দেখতে। এমন কি নিংরু আর মৈকারুইং গ্রাম থেকে পর্যন্ত লোক এসেছিলো। চার বউ-এর কি রাগ। লুটিং তাদের বোঝালে। বললে—"আরে এটা একটা মজা। খানিকটা হৈ-চৈ করা।" তা তারা কি শোনে! ওবা উৎসবে যোগ পর্যন্ত দিলে না।

ছোটো বউ-এর জন্যে লুটিং একটা ভালো খাবার পর্যন্ত বানিয়েছিলো। একটা কুকুরকে একমাস খাইয়েদাইয়ে পুষ্ট করে পরে তাকে মেরে তার পেটে চাল ভরে আগুনে ঝলসিয়ে লুটিং ছোটো বউ-এর জন্যে নিয়ে এসেছিলো। এনেছিলো অন্য বউদের না জানিয়ে। তা ছোটো বউ স্পর্শ পর্যন্ত করলে না। যাক্ গিয়ে। লুটিং পরোয়া করে না। বউদের আপত্তি লুটিং গায়ে মাখেনি। তাদের জন্যে সে কোনো দিনই মাথা ঘামায়নি। তার হাতীর পিঠে চড়ে সে কতো দুর্গম পথে পাড়ি জমিয়েছে। শীতের দিনে সে ওর পিঠে চড়ে অনায়াসে শিবকরণ আর লিম্বুকরণ পার হয়ে গেছে। পাশিঘাটের পথে পথে ওর পিঠে চড়ে লুটিং ঘুরে বেড়িয়েছে। দোকান থেকে পান সিগারেট কিনেছে। আর ওর পিঠে চড়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সারা পাশিঘাট ঘুরে-ফিরে

বেড়িয়েছে। পাশিঘাটের পলিট়িক্যাল অফিসে গিয়েছে ওর পিঠে চড়ে। সেখানে খাজনা জমা দিয়েছে। পলিটিক্যাল অফিসারকে হাতীটা শুঁড় তুলে অভিবাদন করেছে। পলিটিক্যাল অফিসার খুব খুশী। হাতীটা কতোরকম খেলাই না দেখাতে জানে! পলিটিক্যাল অফিসারের বাড়ির জানলা দিয়ে শুঁড় গলিয়ে মূলো বেগুন তুলে এনেছে। পলিটিক্যাল অফিসারের শুয়ে থাকা স্ত্রীর পায়ে শুঁড় দিয়ে সুড়সুড়ি পর্যন্ত দিয়েছে। তারা কতো খুশী! দু টাকা চার টাকা বকশিশ দিয়েছে। লুটিং জানে যে এ হাতীটার জন্যেই সাহেবরা তাকে এতো খাতিরযত্ন করে। শিবসাগর আর লখিমপুরের কমিশনার সাহেবরা এসেই লুটিং-এর হাতীটার খোঁজ করে। ওর পিঠে চড়ে শিকারে যায়। রাস্তার মাঝে নিজেরা চা, রুটি, কেক, ডিম খায়। লুটিংকেও ওসব খেতে দেয়। লুটিং-এর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলোকে হাতীটা যখন শুঁড় দিয়ে পিঠের ওপর বসিয়ে দেয় তখন লুটিং-এর মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। লুটিং-এর হাজার হাজার টাকার কাঠের কারবার। জঙ্গল থেকে সমস্ত কাঠ ঐ হাতীটাই বয়ে নিয়ে আসে। শেকলের এক প্রান্ত জড়ানো থাকে হাতীটার পায়ের সঙ্গে। অন্য প্রান্ত বাঁধা থাকে কাঠ আর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। ইদানীং হাতীটা তরুণী হয়ে উঠেছে। সারা অঙ্গে ওব যৌবন টলমল করছিলো। লুটিং লক্ষ্য করেছে হাতীটা ইদানীং কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে। কেমন একটা উতলা ভাব। কিরকম যেন অন্যমনস্ক—"আমি কি ওকে একটা শক্ত-সামর্থ্য মদ্দা হাতী যোগাড় করে দিতে পারতাম না! আমি কি জানিনে ওর বয়স হয়েছে! অঙ্গে যৌবনের ঢল নেমেছে! আর আমি কি জানিনে যৌবন এলে কি অবস্থা হয়?" লুটিং ময়াং বলে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী আর অসমীয়া ভাষাতে লুটিং আমাকে বলে—"বয়সের কালে আমি কি না করেছি!"

মস্তুপ্ বা অবিবাহিতদের ঘরে রাত্রি জেগে পাহারা দেবার সময় লুকিয়ে মেয়ে নিয়ে এসেছি। জানেন তো গ্রামের অবিবাহিত

যুবকের দল সারারাত একটা ঘরে একসঙ্গে থেকে রাত্রি জেগে সারা গ্রাম পাহারা দেয়! সেখানে মেয়ে নিয়ে আসা বিপজ্জনক। তাও আমি করেছি।" লুটিং ময়াংকে দেখে কেমন ভয় ভয় করে। ওর চোখ আপঙ্-এর নেশায় লাল। লুটিং আবার বলতে শুরু করে —"কেবাং-এ (গ্রাম বুড়োদের সভা) বুক ফুলিয়ে বললাম রাতের ঘটনা। মেয়ে নিয়ে আসার জন্য আমি দায়ী। আমাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে বিশ ঘা বেত মারার হুকুম হল। কেবাং-এর বিচারে তাই ঠিক হল। আমাকে উলঙ্গ করে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা হল। তারপর সপাসপ্ সপাসপ্ বেতের পর বেত।" লুটিং বলতে বলতে মুখখানা এমন করছে যেন ওই মুহূর্তে বেতটা তার পিঠের উপর পড়ছে।

—"শুনেছিলাম বেত মারার সময় হাতীটা ক্ষেপে গিয়েছিলো। আমি কয়েক ঘা বেত খাবার পরেই অজ্ঞান হয়ে গেছি। হাতীটাকে নাকি ওরা কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলো না। ভাগ্যিস শেকলে বাঁধা ছিলো! আমি জানি দুরন্ত যৌবনের কি জ্বালা। আমি ওকে একটা মদ্দা হাতী এনে দিতে পারতাম। সন্তান-সন্ততিতেও ঘর ভরে উঠতো। আমি সব ব্যবস্থা করতাম।" কিছুক্ষণ চুপচাপ। বালু একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে।—"আমার নিজের চারটে বউ। দু ছেলের দুটো করে বউ। আমি কি ওকে একটা মদ্দা হাতী এনে দিতে পারতাম না? আমাকে না বলে পালালো। আটেট্ বাড়ুকে বলে সমস্ত ঠিক করেছিলাম, আটেট্ হাতীর খোঁজ পেয়েছিল। দু-চার দিনের ভেতরই ব্যবস্থা হয়ে যেতো, তা বেটীর সহ্য হল না। নেমক্হারাম!" চিক্ করে খানিকটা থুতু লুটিং ছুঁড়ে দেয়। হতাশা, নৈরাশ্য, বেদনা আর অভিমানে সারা মুখ ভরে ওঠে।

—"কি করে টের পেলে যে অন্য হাতী এসে ওকে নিয়ে গেছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

—"পায়ের ছাপ দেখে। যে খুঁটিটার সঙ্গে ওর পায়ের শেকল বাঁধা ছিলো সেই খুঁটিটা উপড়িয়ে শেকলসুদ্ধ ওকে নিয়ে মদ্দা হাতীগুলো

পালিয়েছে। প্রথমে ছোটো বউটাকে সন্দেহ করেছিলাম। রাগের চোটে বউটার গলা চেপে ধরেছিলাম। ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। মেরেই ফেলতাম ওকে। ও মরে গেলে আমার আবার যথেষ্ট ক্ষতি হত। সাতটা শুয়োর, দুটো মিথোনের বদলে ওকে এনেছিলাম। নূতন করে মিথোন যোগাড় করা বড্ডো কষ্টকর ব্যাপার।”

তবুও লুটিং পরোয়া করে না। কিন্তু বউটা শপথ খেলে।

—“হাতীর পায়ের ছাপ কোথায় দেখলে?”

—“খানিকটা দূরে একটা জলার ধারে। আমার হাতীর পায়ের ছাপ আমার জানা ছিলো। তবে সঙ্গে অনেকগুলো অপরিচিত পায়ের ছাপ। গোটাচারেক হাতী ব'লেই মনে হল।” লুটিং খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—“ছোটো বউটা আসার পর থেকেই হাতীটা কেমন হয়ে গেলো। কেমন মনমরা। কথাবার্তা শুনতে চায় না। কাঠের বোঝা টানতে চায় না। বাচ্চাদের পিঠে সহজে চড়াবে না।”

জিজ্ঞেস করি—“তোমার ছোটো বউ-এর ওপরেই যে চটে আছে তা বুঝলে কি করে?”

—“এ আর বোঝবার কি আছে! একদিন ছোট বউটার সাথে দাওয়ায় বসে খানিকটা ধ্যেমোলি করছিলাম। মানে খানিকটা ফষ্টিনষ্টি। আপঙ্-এর মাত্রাটা বেশী হয়ে গিয়েছিলো। দাওয়ায় পাশ ফিরে শুয়েছি। বউটা গা ঘেঁষে বসেছে। হঠাৎ ওনে ডাই চীৎকার করে ওঠে। চেয়ে দেখি হাতীটার একটা পা ওনে ডাই-এর বুকের ওপর। ছোটো বউ ভয়ে নীল। পায়ের চাপে বোধ হয় সেদিন হাতীটা ওনে ডাইকে শেষই করে দিতো, আমি চীৎকার করতেই হাতীটা পা-টা সরিয়ে নিলো। পরে মাথা নীচু করে চলে গেলো। কি ফোঁসফোঁসানি! বাপ্!”

—“এতো হিংসে?” বলি আমি।

—“ছোটো বউ-এরও হিংসে কম নাকি। এর কয়েক দিন পরেই হাতীটার খাবারের সঙ্গে কি সব বিষাক্ত জংলী লতাপাতা মিশিয়ে দিলে। হাতীটা চোখ বোজে আর কি। মুখ দিয়ে অনবরত ফেনা

গড়ালো। কাদাজলে ডোবাডুবি করলে ঘণ্টা দুয়েক। ছোটো বউটাকে ভালো মতো শাসন করেছিলাম। তা হাতীটা যে এমন ভাবে বেইমানি করবে।" —দাঁতে দাঁত ঘষে লুটিং।

—"হাতীটার কিছু খবর পেলে?" জিজ্ঞেস করে বালু।

—"রেঙ্গিন থেকে বোলেং পর্যন্ত সমস্ত জঙ্গল খুঁজে দেখেছি। গতকাল ওকে দেখলাম। ইয়াম বুং-এর জঙ্গলে।"

—"কি দেখলে?"

—"ওই যা ভেবেছি। মরম আর সোহাগের জন্যে বেটী পাগল হয়ে গিয়েছিলো। চারটে মদ্দা হাতী ওকে ঘিরে রয়েছে। আর শুঁড় দিয়ে সারা গায়ে আদর করছে। আনন্দের চোটে ও চোখ বুজে রয়েছে। রাগে গা-টা জ্বলে গেলো। মনে হল যেন নিজের বউটাকে চারটে মানুষ গুণ্ডাতে ধরে নিয়ে গেছে। বিষ-মাখানো তীর ছুঁড়ে সব কটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। ধনুকে তীর লাগিয়েও ছিলাম। কিন্তু জানো, মনটা কেমন করে উঠলো। জঙ্গল থেকে এই এতোটুকুন অবস্থায় ওকে এনেছিলাম। খাইয়েদাইয়ে ওকে প্রকাণ্ড করে তুলেছিলাম। ও দশফুট উঁচু হয়ে উঠেছিলো। ওর ওজন ছিলো প্রায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড। ও এই অরণ্যের প্রাণীদের ভেতর সব চেয়ে সেরা সুন্দরী ছিলো।" লুটিং অবশ্য হিসেবটিসেবগুলো ওদের প্রচলিত সংখ্যা এবং গণনার ওপর নির্ভর করেই বলেছিলো।

—"তারপর কি হল?" প্রশ্ন করি।

—মদ্দা হাতীগুলো ওকে আদর করতে করতে হঠাৎ আকাশে শুঁড় উঁচিয়ে বাতাসের ঘ্রাণ নিলো। বুঝতে পারলো শত্রু সামনে। ওকে নিয়ে দৌড় দিলে পাঙ্গিনের জঙ্গলে। কোমরে কিছু শুকনো ভাত আর বাঁশের চোঙ-এ আপঙ্ নিয়ে জঙ্গল থেকে জঙ্গলে এ ক'দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার বিবিকে পেলাম না। আমার বউটা আমার সঙ্গে বেইমানি করলো।" লুটিং-এর চোখটা কেমন ছলছল করে।

—"ভেবেছি ওর এই বেইমানির শাস্তি দেবো।" এবার লুটিং-এর

চোখটা জ্বলতে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই ওর চারটে বউ-এর চেয়ে লুটিং হাতীটাকেই বেশী ভালোবাসতো। আমরা তিনজনেই চুপ করে আছি। বোলেং-এর রাতটা কেমন ভয়ঙ্কর। একটা থমথমে ভাব চারদিকে। খুব কাছে একটা হরিণ শাবককে অজগরে গিলছে। হরিণ শিশুর আর্ত চীৎকার। বড্ডো করুণ।

বাঁশের চোঙ থেকে বালু ঘন ঘন তরল আপঙ্ গলায় ঢালছে। মুখটা বিকৃত করছে ঘন ঘন।—"জানেন গলাটা আর ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।" বলে বালু।

—"তবু খাচ্ছেন কেন?" প্রশ্ন করি।

—"কেন খাচ্ছি?" অকারণে হা হা করে বালু হেসে ওঠে।—"ভুলতে চাই এই অরণ্য, পাহাড়, নদী, চাকরি। নেফাকে ভুলতে চাই। আমার সামনে কিছু নেই। পেছনে কিছু নেই। মাঝে মাঝে এ অরণ্যে রাতের অন্ধকারে মনে হয় আমি যেন মানুষ নই। এক অশরীরী। বসে বসে শুধু শুনি ঝিঁঝির ডাক। আর কোনো আক্রান্ত প্রাণীর মরণ চীৎকার। মাঝে মাঝে ট্রানজিস্টারটা খুলে দিই। এই দেখুন।" হাতে মৃদু চাপ দেয় বালু। চেয়ে দেখি সে তার পার্স থেকে একটা ফটো বের করেছে। একটি কচি কোমল মুখ, কতো বয়স হবে—বিশ নয়তো বাইশ।—মিসেস মালহোত্রা।

—"অন্যের স্ত্রীর ফটো আমার পকেটে। খুব অন্যায় করেছি না?" কি বলবো, চুপ করে রয়েছি।

"ছোটবেলা থেকে ওকে জানতাম। ও আমাকে জানতো। কতো ভেবেছি ওর কথা, ও আমার কথা কতো ভেবেছে। ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে ঘর পাতবো। কতো আশা ছিলো। কতো সাধ ছিলো। কতো আকাঙ্ক্ষা। নেফা সব কিছুর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। আশা নিরাশার রূপ নিলো।" লুটিং ময়াং-এর গল্পের ঠিক পরেই এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। বোলেং-এর জঙ্গলে দুটি অতৃপ্ত হৃদয়ের কাহিনী শোনাবার জন্যেই কি আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে! কিছু

বলতে হবে, না হলে ভালো দেখায় না। তাই বলি·········

—"বিয়ে হল না আপনাদের ?"

—"নেফার চাকরি শুনে ওর বাবা-মা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হল না। তাদের মেয়ের স্থান নেফার জঙ্গলে নয়। বুঝিয়ে বললাম যে দু-চার বছরের বেশী হয়তো নেফাতে থাকতে হবে না। তারা শুনলো না। আমার যুক্তি মানতে রাজী হল না। তারা মেয়ের জন্য অন্যখানে পাত্র খুঁজতে শুরু করলো।" ভাবি কি সান্ত্বনা দেবো ওকে। চুপ করে ওর কথা শুনে যাই। চারিদিকে কতো সমস্যা। কি অদ্ভুত আর কি বিচিত্র এ জগৎ! কতো ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে তার খোঁজ কেউ রাখে না। বোলেং-এর জঙ্গলে দুটি অশান্ত হৃদয় মাথা কুটে মরছে। নেফার কর্তৃপক্ষ জানে না তারা কিভাবে হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তারা টেণ্ডার কল্ করেছে। ক্যাল্ভার্ট আর ব্রীজের বল্টু নাটের হিসেব রেখেছে। নেফার চাকরির জন্যে থারটিথি্ এ্যাণ্ড ওয়ান্-থার্ড এ্যালাউয়েন্স ঘোষণা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। প্ল্যান আর প্রজেক্ট নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। কোন্ প্ল্যানে কতো সড়ক বানিয়েছে, কতোটা শিক্ষা ছড়িয়েছে তার বিজয়বার্তা সদর্পে ঘোষণা করেছে। নেফার কর্মচারীদের অনেক কিছু সুখ-সুবিধার জন্যে লড়াই করেছে। তারা কি বালুর মনের খোঁজ রেখেছে? তারা কি জানে নেফার চাকরির জন্যে মেয়ের বাপ ছেলের হাতে মেয়ে দেয় না?

—"নেফার চাকরি ছেড়ে দিতাম। কিন্তু সংসারের অনটন আর অভাব চোখে দেখা যায় না। নেফার চাকরিতে ঢোকার জয়েনিং ডেট্টা মাসখানেক এগিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। আশা ছিলো ও সময়ের ভেতর ওর বাপ-মাকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারবো। কিন্তু তা হল না।

"কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করতে রাজী হল না। আর কর্তৃপক্ষকে দোষ দিয়েই বা কি লাভ? সিয়াং-এর নদীতে ব্রীজ বানাতে হবে। সুবনসিরিতে

জঙ্গল সাফ করে রাস্তা বানাতে হবে। কামেং ডিভিসানে এরোপ্লেন নামবার রানওয়ে বানাতে হবে। অনেক কাজ। ওর অন্যের সাথে বিয়ে হয়ে গেলো। পাশিঘাটে বসে ওর বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি পেলাম। আমাকে বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ করেছে। সে রাতে মাতাল হয়ে পাশিঘাটের আশেপাশের অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

বালু ঢক্‌ঢক্ করে গলায় আপঙ্ ঢালে। বাইরে বাঘ ডাকছে। লুটিং ময়াং কপালটা চেপে বসে আছে। ওর হাতীটা ওর সঙ্গে বেইমানি করলো। ও জানতো জানোয়ার বেইমানি করে না। বেইমানি করে না বলেই তারা এতো ভালো। তাদের লুটিং এতো ভালোবাসে। তার হাতীটাকে সে তার চার বউ-এর চাইতে অনেক বেশী ভালোবাসতো।

* * * *

গভীর রাত্রিতে ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে যায় ভীষণ শব্দ, হুঙ্কার আর গর্জনের ভেতর। মনে হয় বাঁশের ঘরের বাইরে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে! ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন। আর উন্মত্ত হাতীর ডাক। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? ভীষণ জোর বাসাবাড়িটা দুলছে। মাটি থরথর করে কাঁপছে। অন্ধকার ঘরে কিছুই নজরে আসে না। তবে এটা বুঝতে পারি বেশ যে এরকম কিছুক্ষণ চললে টিলার ওপর থেকে এ বাসাবাড়ি আমাদের নিয়ে গড়িয়ে পড়বে।—"বালু! বালু!" আস্তে আস্তে ডাকি। এ গভীর অন্ধকারে দিক্‌নির্ণয় করা মুশকিল।—"এই যে আমি!" বালু প্রায় মেঝের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে আমার কাছে হাজির হয়।—"বাইরে কি হচ্ছে এসব? মনে হচ্ছে এ ঘর টিকবে না!" আমি বলি।

—"হাতী আর বাঘে লড়াই হচ্ছে।" বলে বালু।

—"আপনি এর আগে কখনো এরকম যুদ্ধ দেখেছেন?"

—"হ্যাঁ, এর আগেও এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।" দুটো উন্মত্ত জানোয়ারের সে কি গর্জন! ফুঁসছে, গর্জাচ্ছে। ঘরের ভেতর থেকে বেশ বুঝতে পারি যে দুজন দুজনকে মরণ কামড় দিয়েছে।

—"লুটিং কোথায়?" প্রশ্ন করি।

—"সেটাই তো বলতে পারছিনে। গড়াতে গড়াতে গিয়ে লুটিং-এর খোঁজ করেছিলাম, তার বিছানায় কেউ নেই।"

—"সে কি ?" আমি বিস্মিত। বিমূঢ়।

—"লুটিংকে না দেখে বড্ডো চিন্তিত হয়ে পড়েছি।"

—"গুলি চালাবেন নাকি ?" প্রশ্ন করি।

—"না।" বলে বালু। বাঁশের তৈরী রান্নাঘরটার ওপর একটা ভারী বস্তু এসে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় শব্দ তুলে গোটা রান্নাঘরটা মাটির ওপর নেমে আসে। হুঙ্কার আর গর্জনে সমস্ত বনভূমি কাঁপছে। বালু রাইফেলে গুলি ভরে বলে—"চলুন পাশের ঘরের জানলা থেকে টর্চের আলো ফেলে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করি। সেরকম দরকার হলে গুলি ছুঁড়বো। তবে ওরা নিজেদের ভেতর আপন মীমাংসা করতে চাইছে—বাইরের কারুর হস্তক্ষেপ পছন্দ করবে না। আর ওদের মীমাংসা ওরা করুক। তৃতীয় ব্যক্তির এর ভেতর আসা উচিত নয়। জঙ্গলের নিয়মই তাই।" বালুর অনেক অভিজ্ঞতা। এরকম অবস্থার ভেতর সে আগেও পড়েছে। টর্চের আলোতে যে দৃশ্য দেখেছিলাম তা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী তার শুঁড় প্রবল বিক্রমে দোলাচ্ছে। এদিক থেকে ওদিকে। শুঁড়ে জড়িয়ে রয়েছে একটা বাঘ। হাতীটা প্রবল বিক্রমে এবং ক্ষিপ্রগতিতে শুঁড়টা ঘন ঘন নীচে নামিয়ে আনছে আর শুঁড়ের সঙ্গে মাটির সংঘর্ষে বাঘটা ঘনঘন পিষ্ট হচ্ছে। দুটো জন্তুই ভীষণভাবে জখম হয়েছে। দুজনের দেহ থেকে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। বাঘটা হাতীর শুঁড়ে জড়িয়ে থেকে হাতীটাকে আঁচড়িয়ে, কামড়িয়ে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। হাতীটার শুঁড় মাটিতে ঘন ঘন আছড়ানোর ফলে বাঘটার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে। বালুর টর্চের আলো পড়তেই দুজনে খানিকটা সময় থমকে দাঁড়িয়েছিলো। তারপর আবার লড়াই শুরু হয়েছিলো। বালু বলেছিলো—"অরণ্যের এ যুদ্ধে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। তবে নিজেদের জীবন বিপন্ন হলে তখন অন্য কথা।" টর্চের

আলো আর ফেলেনি। রাইফেল বাগিয়ে বালু দাঁড়িয়েছিলো। মিনিট পনেরো পরে যুদ্ধ শেষ। বনভূমি শান্ত। টর্চের আলো ফেলে দেখলাম হাতীটা বাঘটাকে শুঁড় থেকে মুক্ত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে পেছনের পা দিয়ে দলে প্রায় কাদার তাল করে ফেলেছে। হাতীটার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত। হাতীটার গা থেকে রক্ত ঝরছে ঠিক ফোয়ারার মতো। হাতীটা মাতালের মতো টলছে। এর পর সে একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। বোধ করি শেষবারের মতো বিজয় ঘোষণা করে গেলো।

এর কিছুক্ষণ পরেই লুটিং ময়াং-এর খোঁজ পেয়েছিলাম। আমাদের ঘরের হাত দশেক দূরে একটা নালার ধারে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। তার পিঠে বাঘের থাবা পড়েছে। গায়ের জামাটা রক্তে চপ্‌চপ্ করছে। লুটিং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়েছিলো। আপঙ্-এর মাত্রাটা বোধ হয় বেশী হয়ে গিয়েছিলো। খেয়ালই করেনি সে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাঘটা এসেছিলো নালার পাশে ঝোপের ভেতর মৃত হরিণের বাসি মাংস খেতে। বাসি মাংস ছেড়ে সে টাটকা মাংসের দিকে ঝুঁকে ছিলো। লুটিংকে হয়তো প্রাণে বাঁচতে হত না যদি না হাতীটা সময় বুঝে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতো। হাতীটা ওই সময়ে কেন এদিকে এসেছিলো বোঝা যায়নি। কিন্তু লুটিং-এর জ্ঞান হবার পর তার সে কি কান্না! পায়ের ছাপ দেখে সে বুঝেছে এ তার হারানো হাতী। একটা মানুষ যে একটা জন্তুর জন্যে এরকমভাবে কাঁদতে পারে এ ধারণা আমার আগে ছিলো না। হাতীটা বেইমানি করেনি। যাবার আগে লুটিংকে নূতন জন্ম দিয়ে গেলো। লুটিং-এর চার বৌ যে ভালোবাসা দেখাতে পারেনি হাতীটা সেই ভালোবাসা দেখিয়ে গেলো। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে গেলো।

লুটিং হাসপাতালের খাটে শুয়ে আমাকে বলেছিলো—"মিগম্।" নেফা অরণ্যে কেউ বেইমানি করে না। "মিগম্" বলে আমাকে সম্বোধন করে লুটিং আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলো।

॥ তিন ॥

পাশিঘাটের এয়ার ফিল্‌ডের গল্প শোনাই। এয়ারফিল্‌ড ছোটো। ছোটো প্লেনই ওখানে নামতে পারে। প্লেন নামার জায়গা ছাড়া বাকী অংশ ঘাস আর জঙ্গলে, আগাছা আর ঝোপঝাড়ে বোঝাই। প্লেন নামবার ওঠবার রানওয়ে আগাগোড়া লোহার পাত দিয়ে মোড়া। লোহার পাতে সূর্যের আলো পড়ে ঝক্‌মক্ করে। এই রানওয়ে ধরে রবারের চাকার ওপর ভর করে প্লেন দৌড়য়। অনেকটা দূর দৌড়িয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায়। আকাশের বুকে ক্রমশঃ ছোট হতে হতে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়। তারপর একসময় মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। যতোক্ষণ দেখা যায় ততোক্ষণ এয়ারফিল্‌ডের লোকগুলো তাকিয়ে দেখে। প্লেনটা উড়ে যায় জিরো, আলং, টাবাসোরা, বুড়াগাঁও আর ওয়ালাং-এর পথে। প্লেনের ভেতরে রয়েছে তেল, চাল, চিনি, আটা, আর ময়দা। গলা পর্যন্ত চটের থলি জড়ানো ভেড়াও রয়েছে। এয়ার ড্রপিং হবে। দুর্গম সব অঞ্চলে লোকগুলো হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মার্চ এপ্রিল থেকে দুরন্ত বর্ষা শুরু হয়। একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ে। বিশ দিন থেকে পঁচিশ দিন। বৃষ্টির বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পার্বত্য নদীগুলোর দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় করে। রাস্তাঘাট জলে ভেসে যায়। নেফার অরণ্য আরো ভয়ঙ্কর। আরো ভীষণ হয়ে ওঠে। ঝড়, জল, কুয়াশার ভেতর এয়ার ড্রপিং। ভীষণ কষ্টকর। যে কোন মুহূর্তে পাহাড়-পর্বতের গায়ে লেগে প্লেন চুরমার হয়ে যেতে পারে। দুর্গম অঞ্চলে লোকগুলো খানিকটা আটা আর চালের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। পাশিঘাট থেকে প্যাসেঞ্জার মোহন বাড়ী এরোড্রামে নিয়ে যাবার জন্যে সপ্তাহে একবার মাত্র প্লেন আসে। কোনো মাসে বর্ষার আধিক্যের জন্যে চৌদ্দ থেকে বিশ দিনের ভেতর প্লেন নামতে পারে না। পাশিঘাটের আশেপাশে চক্কর দিতে দিতে প্লেন একসময় ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়। লোকগুলো

মালপত্তর গুটিয়ে এয়ারফিল্ড থেকে ঘরে ফিরে যায়। দিনের পর দিন অপেক্ষা করার পর তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এয়ারফিল্ডের অফিস ছোট্টো একটা বাড়িতে। সিমেন্ট আর চুন-সুরকির তৈরী। পাশিঘাটের অন্যান্য বাড়িগুলো কাঠ বা বাঁশের তৈরী। এয়ার অফিসের বারান্দায় গোটাচারেক বেতের চেয়ার। হাতল নেই। বেত খুলে গেছে। কেউ বসতে চেষ্টা করে না। বারান্দার পাশে একফালি উঠোন। সন্ধ্যামালতী লতা থেকে টুপ্ টুপ্ করে জল ঝরে পড়ে। লাইন করে জবাফুলের গাছ। একরাশ লাল ফুল নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। পাশিঘাটের এয়ার অফিসের এ বারান্দার ইতিহাস রয়েছে। প্লেন এয়ারফিল্ডে নামবার দিন এ বারান্দাতে জনসমাগম হয়। সারা পাশিঘাট ভেঙ্গে পড়ে। পুরুষ আর নারী। কর্তা আর গিন্নী। অফিসের সি জি ওয়ান আর সি জি টু। ক্লাস টু আর ক্লাস ওয়ান অফিসারের দল এখানে ভিড় জমায়। কে আসছে আর কে যাচ্ছে তাদের জানতে হবে। পলিটিক্যাল, মেডিক্যাল, এডুকেশন, সি পি ডবলু ডি অফিসের সবাই এসে এখানে ভিড় করে।

এমনিতে পাশিঘাটে করবার কি আছে। বাঁশের ঘরে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের দল দুপুর বেলা ঝিমোয়। পলিটিক্যাল অফিসে পাঙ্খা-পুলার আসেনি। পাখা কে টানবে। অতো গরমে ফাইলের লাল ফিতে খুলতে ইচ্ছে করে না। প্লেন কখনো শেডুল টাইমে পৌছয় না। পাশিঘাটে পৌছতে কোনোদিন একঘণ্টা, কোনোদিন দুঘণ্টা, কোনোদিন তিনঘণ্টা পর্যন্ত দেরি হয়। এয়ার অফিসে সমবেত লোকগুলির কিন্তু ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে না। গল্পে আর আলাপে তারা মশগুল হয়ে ওঠে। আর প্লেন ফিল্ডে নামলেই বা কি। তাকে ধোয়া, পোঁছা আদরযত্ন করে পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুত করতে অনেকটা সময় নেবে। প্লেনের তেল, নুন, চিনি সাফ হবে। ঝাড়পোছ চলবে। প্যাসেঞ্জারদের জন্যে সীট লাগানো হবে। আলাদা চেয়ার নিয়ে বসাতে হবে। প্লেনের দরজা স্ক্রু দিয়ে আঁটতে হবে। এয়ার ড্রপিং-এর সময় দরজা খুলে নেওয়া হয়।

প্লেনটা যখন উড়ে আসে তখন বড্ডো ভালো লাগে। আর যখন উড়ে চলে যায় তখন মনটা বিষাদে ভরে ওঠে। যাদের স্ত্রীরা রয়েছে গৌহাটি আর তেজপুর, কলকাতা, মাদ্রাজ, কিংবা দিল্লীতে তাদের চোখ সজল হয়। যাদের ছেলেমেয়েরা রাজস্থানের স্কুলে কলেজে অথবা দেরাদুন বা মাদ্রাজের স্কুলকলেজের হোস্টেলে যারা পড়াশুনো করে তাদের জন্যে এখানকার লোকগুলোর মন কেমন উদাস হয়ে ওঠে। প্রায় বছরখানেক হলো ওরা ছেলেমেয়েদের দেখেনি। কতো বড়ো হলো কে জানে। নেফার অরণ্যে ছেলেমেয়েকে আনা মুশকিল। লেখাপড়া হবে না। দত্ত চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। বড়ুয়া জিজ্ঞাসা করে—"চোখে কি হলো?"—"না। না। চোখে কি যেন উড়ে এসে পড়েছে।" জবাব দেয় দত্ত। অতিকষ্টে সে চোখের জল গোপন করছে। সি পি ডবলু ডির ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী দিল্লীর স্কুলে চাকরি করে। ছেলেমেয়েরা সেখানে স্কুলে পড়ে। স্ত্রীর মুখখানা ইঞ্জিনীয়ার স্বরূপের চোখে ভাসে। আজ কি একটা পরব রয়েছে। দিল্লীর সব স্কুল আজ বন্ধ। স্বরূপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মার হাত ধরে ছেলেমেয়েরা কন্‌ট প্লেসের রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সি পি ডবলু ডির ইঞ্জিনীয়ারদের নেফাতে থাকার মেয়াদ প্রথমে ছিলো দু বছর। এখন বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়েছে। স্বরূপের মাত্র এক বছর হলো। ভালো লাগে না। রেজিগ্‌নেশন্ লেটার লেখার জন্যে হাতটা নিশপিশ করে। মিসেস সেনগুপ্ত কারফরমার স্ত্রীকে বলছে—"ডিব্রুগড়ের বাজার থেকে টাট্‌কা মুড়ি আনতে ভুলবেন না যেন দিদি।" কারফরমার স্ত্রী ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নোট-বই বের করে মুড়ির ব্যাপারটা নোট করে নিলো। অর্ডার কম নয়। কারো মুড়ি, কারো চিঁড়ে, শাড়ি, ব্লাউজ, ঔষধ, ঘি। মায় ফলফুলের শুকনো বীচি পর্যন্ত। এতো মনে রাখা মুশকিল। তাই নোট-বই সঙ্গে নিতে হয়। স্যাক্‌সেনা প্রসাদের হাতে কয়েকখানা চিঠি গুঁজে দেয়। ডিব্রুগড় থেকে চিঠি পোস্ট করলে দু'চার দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। নয়তো দেরী হবে। প্লেনের পাইলট তার বিশ্রামঘরে পৌঁছে পকেট থেকে রামের বোতল বের

করে। ছিপি খুলে খানিকটা গলায় ঢেলে সে বোতলটা মুখার্জীর হাতে তুলে দিয়েছে। মুখার্জীকে পাশিঘাট থেকে মেবোর রাস্তায় ট্যুরে যেতে হবে! দুদিন জঙ্গলে আর পাহাড়ে কাটাতে হবে। বোতলের দরকার আছে। ইদানীং আপঙ্ মুখার্জীর সয় না। তাই রামের বন্দোবস্ত। মেবোর ইন্‌স্‌পেক্‌সন্ বাংলোতে সন্ধ্যেটা জমবে ভালো।

ডিব্রুগড়ে আমি প্লেনের পাইলটদের থাকবার মেসবাড়ীর কাছাকাছি কিছুদিন ছিলাম। প্লেন কোম্পানীর মালিকরা পাইলটদের জন্যে সবরকম সুখ-সুবিধের বন্দোবস্ত করেছিলো। হাসিখুশী স্বাস্থ্যে ঝলমল পনেরো ষোলোটি তরুণ। বাড়ি সরগরম। খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড়, চিকেন সুপের গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে। তারপর একে একে নিভিছে দেউটি। ওদের সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে কমতে শুরু করে। ঠিক হারাধনের দশটি ছেলের অবস্থা আর কি! দুর্গম পথে পাড়ি জমাতে গিয়ে পাহাড়-পর্বতের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্লেন হামেশাই চুরমার হতো! মেসে ঠাকুর চাকর ছিলো অনেকগুলো! দেখেছি তারা গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছে। ছেলেগুলোর জন্যে আমার কাছে দুঃখ করতো। কিন্তু ছেলেদের ভয় ডর বলে কিছু নেই। এক তরুণীকে তিনজন বগলদাবা করবার চেষ্টা করছে। এই একটু আগেই খবর এসেছে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ডাপোরাজিওর পথে নিখোঁজ হয়েছে।

একটা দুপুর পাশিঘাটের এয়ার অফিসের বারান্দা আর ঘর সরগরম হয়ে ওঠে। বাকী ছ'দিন কোলাহলশূন্য। জনমানবহীন। আজকের দিনটাতে কতোরকম আলোচনা। কতো গল্প আর গুজব, মশকরা আর ঠাট্টা। পলিটিক্যাল অফিস বোলানের নূতন সড়কটা বানানোর অনুমতি এখনো দেয়নি। সি পি ডবলু ডির এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার তাই মুখ গোমড়া করে রয়েছে। এ্যাসিস্‌টেন্ট পলিটিক্যাল অফিসারকে দেখেও যেন দেখলো না। একটা কথা না বলে পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলো। মেবোর লাইটের বন্দোবস্ত শীগগীর হবে না বলে।

ইলেকট্রিক্ ইঞ্জিনীয়ার জানিয়েছে। অনেক অসুবিধে রয়েছে। শিলং

ডাইরেক্টরেট্ থেকে মেমো এসেছে। দুদল গরম গরম নোট লিখছে। আর দেরি হলে নাকি ওয়ারনিং আসবে। এ পিও টু মানে এ্যাসিস্টাণ্ট পলিটিক্যাল অফিসার দু নম্বর। পদমর্যাদায় যার স্থান এ পিও ওয়ানের ঠিক নীচে। এর ওপরে ডি সি মানে ডেপুটি কমিশনার। আজ রাতে পাওয়ার সাপ্লাই আরো এক ঘণ্টা বেশী চালু রাখবার জন্যে ইলেকট্রিক্ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে এ পিও টু অনুরোধ করেছে। এমনিতে পাশিঘাটের আলো আটটার পরে অফ্ হয়ে যায়। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আলো থাকে। আর কটা বাড়িতেই বা ইলেকট্রিক্ আলো রয়েছে! ইলেকট্রিক্ ইঞ্জিনীয়ার কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এ পিও টু ভাবে রাতের পার্টিটা কি তাহলে মাঠে মারা যাবে। সারা পাশিঘাটের দুধ নাকি হাসপাতালের রোগী মারফৎ ডাক্তারদের ঘরে চলে যাচ্ছে। পাশিঘাট স্কুলের হেড মাস্টারের স্ত্রী এতে মর্মাহত! এ বড্ডো অন্যায়। তাই এর প্রতিকারের আশায় মিসেস্ থাডানি গতকাল সন্ধ্যায় একটা মিটিং ডেকেছিলো। মিটিং-এ মেয়েরা কেউ আসেনি। আসবে কেন! সারা সন্ধ্যে আর সারা রাত্রি তারা পার্টিতে মেতে উঠেছিলো। মিটিং এ্যাটেণ্ড করবার সময় কোথায়। তরল পানীয়ের সঙ্গে টুইস্ট। দুধ জমে দই হয়ে যাক। দই থেকে বার হোক ঘোল। দেখবার সময় কোথায়?

এ প্লেনে দত্তর স্ত্রী পাশিঘাটে এসে পৌঁছেছে। হাজারিকার স্ত্রীর তার কাছে রান্নার মশল্লা আনার আবেদন ছিলো। হাজারিকা আর তার স্ত্রী প্রথমে যাবে লোহিতের নামসাইতে। তারপর চোখাং আর তেজুতে। মশল্লা ছাড়া রান্না কি দিয়ে করবে! এয়ার অফিসের বারান্দায় মেয়ে-পুরুষের সম্পর্কটা নিবিড় হয়েছে। সমাদ্দার মজুমদারের হাতটা চেপে ধরে বলে—"মলমটা ভাই ডিব্রুগড় থেকে এনো। চুলকোতে চুলকোতে মরলাম। পোকাগুলো শুয়োরের গা থেকে নেমে এসে বড্ডো কামড়ায়। আর চুলকোতে চুলকোতে সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়।" ওরাং বাটু আর জাওলাপ্রসাদের নৌকো

সিয়াং আর ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেয়। দুর্গম, দুরূহ পথে ওইরাম ঘাটে পৌঁছুনো এক কষ্টকর প্রচেষ্টা, তারও পর বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেওয়া এক অসাধ্যসাধন গোছের কিছু। মোটর বসানো ছোট্টো এইটুকুন বোটের ওপর ভরসা করা যায় না। ব্রহ্মপুত্রের যে চেহারা। সুতরাং বর্ষার সময় ভরসা ওই ছোট্টো প্লেন। কালো কালো গগলসে চোখ ঢেকে দু'চারজন আধুনিকা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। হাতকাটা ব্লাউজ। পেটে পিঠে কাপড় নেই। রোদ থাক বা নাই থাক। ওরা ঘরে থাক বা বাইরে থাক। মেঘ হোক কিংবা বৃষ্টি হোক। এদের চোখ থেকে গগলস্ কখনো নামবে না। তুমি তোমার দৃষ্টিকে লুকিয়ে অন্যকে ভালো করে দেখে নাও। জানতে দিও না তুমি কাকে দেখছো। কখন দেখছো। কি ভাবে দেখছো।

দত্তর স্ত্রী সুন্দর পাঞ্জাবী ছেলেটাকে আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছে। প্লেনটা দৌড়ুবার আগে প্রচুর হাওয়ার সৃষ্টি করে। কি হাওয়া বাপ্‌রে বাপ্। শাড়ি ধুতি সামলানো দায়। প্লেনের মেরামতি শেষ। ঝাড়-পোঁছ হয়ে গেছে। প্লেন এখুনি ছাড়বে। একটি দুপুর মন্দ কাটলো না। সন্ধ্যের পর আবার সেই অন্ধকার। ভয়াবহ নির্জনতা। সাপ, জোঁক। পাশিঘাটের এ বারান্দায় অনেক খবর দেওয়া নেওয়া হলো। অনেক হৃদয়ের উষ্ণ পরশ মিললো। প্লেন আকাশে উড়বে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হৃদয় আকাশে উড়বে। অনেক আশা। অনেক আকাঙ্ক্ষা। ভট্টাচার্য প্লেন অফিসের কর্মচারী। প্লেনকে খুঁটিয়ে-নাটিয়ে দেখবার ভার তার ওপর। জিনিসপত্র, তোরঙ্গ, বিছানা, সব রকম মালপত্তরের তদারক করা তার কাজ। ভট্টাচার্যের তদারক শেষ। সে প্রথমে পাইলটকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখাবে। পাইলট ইঞ্জিনে স্টার্ট দেবে। বাম হাতের বুড়ো আঙুল দেখালে প্লেন দৌড় শুরু করবে। দৌড়ুতে দৌড়ুতে প্লেন একসময় আকাশে উঠে যাবে। পাশিঘাটের এয়ার অফিসের বারান্দায় দাঁড়ানো লোকগুলো প্লেনটার দিকে তাকিয়ে থাকবে। যতোক্ষণ দেখা যায় ততোক্ষণ

দেখবে। প্লেন মোহনবাড়ী এরোড্রোমে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে এয়ার-ড্রপিং-এ চলে যাবে। চলে যাবে বম্‌ডিলা, টুটিং আলং, ডাপোরাজো, মেচুকা, ওয়ালাং আর তেজুর পথে যেখানে লোকগুলো খাদ্যসামগ্রীর জন্যে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এয়ার স্ট্রীপে আদি অধিবাসীরা ভিড় জমিয়েছে। অনেকেরই কোমর থেকে একফালি ন্যাকড়া ঝুলছে। পাশে বেতের খাপে ঝকঝকে দা। দা-এর এককোপে প্রকাণ্ড অজগরকে ওরা দু-টুকরো করে ফেলে। বন্য বরাহ আর ভালুকের পেট ফাঁসিয়ে দেয়। চিতার চোখ উপড়িয়ে আনে। ওরা হাততালি দিচ্ছে। আর নেচে নেচে গান গাইছে। গানের ভেতর পাখীটার শুভযাত্রা কামনা করছে। শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে সরল হাসিখুশী মানুষগুলো। যাত্রীরা মোহনবাড়ী এরোড্রোমে পৌঁছে বাস বা মোটরে করে যাবে ডিব্রুগড়। ডিব্রুগড় থেকে বেরিয়ে পড়বে অনেকেই। কেউ যাবে মার্গেহাটা, কেউ বা ডিগ্‌বয়। জোড়হাট, শিবসাগর, লখীমপুর আর শিলং-এর পথে যাবে। যারা শুধু ডিব্রুগড়ে থাকবার জন্যে এসেছে তারা দৌড়ুবে ডিব্রুগড়ের বাজারে। পেট পুরে এটা ওটা খাবে। চপ্‌-কাটলেট্ এবং অনেক কিছু! সারা পাশিঘাটে একটা রেস্তোরাঁ নেই, নেই একটা হোটেল। দুদিন ডিব্রুগড়ে থাকলে চারটে সিনেমা শো দেখবে। দুপুরের শো শেষ করে ছুটবে সন্ধ্যার শোতে। হিন্দী, বাংলা, অসমীয়া ছবি দেখবে। পাশিঘাটে সিনেমা নেই। বড্ডো মুশকিল! বাইরের দুনিয়ার খবরই কেউ রাখতে পারে না। খবরের কাগজ পৌঁছয় বেশ কয়েক দিন পরে। যখন খবর বাসি হয়ে যায়। ডিব্রুগড়ের দোকানগুলো ওরা ঘুরে ঘুরে দেখে। দাম যাচাই করে। পাশিঘাটে একটা কি দুটো দোকান, মাড়োয়ারী দোকান। তাদের নৌকোয় করে ব্রহ্মপুত্র থেকে মাল আনতে হয়। অনেক মেহনত। অনেক পরিশ্রম, অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। তাই পাশিঘাটে মাল এনে দু টাকার জিনিস দশ টাকায় না ছাড়লে চলে না। জিনিস এনেই বা কি করবে! কেনবার লোকের অভাব।

যাক গিয়ে। এবার এয়ারফিল্‌ডের অফিসঘরে ফিরে আসা যাক। এয়ারফিল্‌ডের অফিসে ললিতা ডাট্‌কে দেখে আমি চমকে উঠি।

ললিতা এখানে ? ললিতার সঙ্গে এক ভদ্রলোক। আন্দাজ করলাম চল্লিশের উর্ধ্বে বয়স। ললিতার স্বামী বলেই মনে হলো। তাহলে শেষ পর্যন্ত ললিতা বিয়ে করেছে! ওর স্বামী নিশ্চয়ই নেফাতে চাকরি করে। সমস্ত নেফা ঘুরে বেড়ায়। ললিতার ধবধবে সাদা রঙে খানিকটা মালিন্য এসেছে। চুল বব্‌ করা। ঠিক আগের মতো। ঠোঁটে পুরু লিপ্‌স্টিক। মুখে রং-এর প্রলেপ। তিলটা কৃত্রিম। ঠিক জায়গামতোই বসিয়েছে। না কোথাও ত্রুটি নেই। ললিতার চোখে মুখে ক্লান্তির আভাস। আগেকার সেই সতেজ ভাব নেই। বেশ বুঝতে পারি ললিতা ঘন ঘন আমাকে দেখছে। চিনতে পেরেছে নিশ্চয়। চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। শিলং ছাড়বার পর অনেকগুলো বছরের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়েছি। ললিতা আর ওর স্বামী প্লেন ছাড়বার অপেক্ষায় রয়েছে। প্লেন এয়ারফিল্‌ডে নেমেছে। প্লেনের ঝাড়পোঁছ চলছে। বসবার সীট্‌ জুড়ছে। মালপত্তরে জঠর ভর্তি করে ডিব্রুগড়ের পথে পাড়ি জমাবে। আর কোনদিন হয়তো ললিতাদের সঙ্গে দেখা হবে না। ওদের সঙ্গে খানিকটা আলাপ করতে দোষ কি ? গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো।

ঘরের কোণে রাখা মাটির কলসী থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে নিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেবো বলে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যে ঘরে রয়েছি তারই পাশের ঘরে রয়েছে ললিতা আর তার স্বামী। মাঝখানে একটা পাতলা কাঠের পার্টিশান্‌। গ্লাসে জল ঢালছিলাম হঠাৎ কয়েকটি কথা কানে ভেসে আসে। ললিতার কণ্ঠস্বর।—"ওই লোকটাকে লক্ষ্য করেছো !" তারপর স্বামীকে নিরুত্তর দেখে—"ওই যে গো যার গায়ে সাদা শার্ট আর পরনে নীল রঙের ট্রাউজারস্‌।"

"দেখেছো বোধ হয়। লোকটা আমার দিকে কেমন প্যাট্‌প্যাট্‌ করে তাকাচ্ছিলো। মনে হয় জন্মবয়সে মেয়েছেলে দেখেনি।" বুঝতে

পারলাম আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। কলসীর জল কলসীতে রইলো। আমার হাতে গ্লাসটা ধরা রয়েছে। তৃষ্ণার কথা ভুললাম। কাঠের পার্টিশানের সঙ্গে কান লাগিয়ে বাকী কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করলাম। স্বামী বলছে—"হয়তো তোমার মত সুন্দরী ওর জন্মবয়সে ও দেখেনি।" "—ধেৎ! তাই বলে কেউ ওরকমভাবে তাকায় নাকি! অসভ্য পুরুষ। মেয়েছেলের দিকে কিরকমভাবে তাকাতে হয় তা পর্যন্ত শেখেনি। মনে হয় ও শুধু দৃষ্টি নয়। দৃষ্টি দিয়ে লেহন করছে।" ভদ্রলোক হো হো করে হেসে ওঠে। আমার কিন্তু সব শুনে রাগ হয় না। ললিতা ডাট্ বদলায়নি। ঠিক আগের মতো রয়েছে। যেদিন ওর কুকুরটাকে শিলং-এর ওয়ার্ড লেকের জল থেকে উঠিয়েছিলাম সেদিনও ললিতা এরকম কথাবার্তা বলেছিলো। কুকুরটা অসুস্থ ছিলো। নোটিশ না দিয়ে নৌকো থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলো। ললিতা কুকুর নিয়ে জল-বিহারে বেরিয়েছিলো, আমি ওয়ার্ড লেকের ধারে বাগানে পায়চারি করছিলাম।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে কুকুরটাকে জল থেকে তুলে নৌকোতে নিয়ে তুলেছিলাম। ললিতা ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়ে কুকুর নিয়ে মেতে উঠেছিলো। কুকুরের আদর যত্নে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। নগণ্য মানুষটার কথা মনে হয়নি। আমাকে একসময় বলেছিলো—"আপনি এখন ওকে আদর করতে পারেন। তা আপনার হাত পরিষ্কার আছে তো? ওর গায়ে একটা ক্ষত রয়েছে। ভয় হয় সেপটিক্ না হয়ে যায়" জবাব দিতে ইচ্ছে হয়নি।

এর পরে শিলং-এ ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আলাপ থেকে পরিচয়। পরিচয় শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়েছে। আমি গরীব সন্তান। ললিতা ছিলো ধনীর কন্যা। শিলং ক্লাবের রিসেপসনিস্ট্। ওর বব করা চুল। মোমের মতো সাদা দেহ। অদ্ভুত রূপসী! ললিতা পার্টিতে যায়। ডান্সে যোগ দেয়। মেজর আর কর্ণেলকে করুণা বিতরণ করে। টি গার্ডেনের সাহেবসুবো, ম্যানেজার

আর্ট ডাইরেক্টরের দল ওর জন্যে পাগল হয়। ও বাবাকে ডাডি বলে। মাকে মামী বলে। সুইট্, হাউ নাইস্ আর ওয়াণ্ডারফুল ওর মুখে লেগেই আছে। ও শ্ল্যাকস্ পরে বিয়ারে চুমুক দেয়। আমার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হবার কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে বের করতে পারিনে। "স্বর্গভূমির" ম্যানেজার মানে আমার হোটেলের ম্যানেজার পূর্ব-পাকিস্তানের লোক। সে বলে—"তুমি জানতি পারোনি তুমি সুপুরুষ! মাইয়ালোকের তোমারে দেখলে বুক ধড়ফড়ানি শুরু হইয়া যায়। এইটা স্বাভাবিক। ওই কারণে ব্যাবাক্ ফ্যালাইয়া তোমার কাছে দৌড়াইয়া আসে।" হাউ নাইস্! হাউ সুইট্! লাভলি! ওসবের পর এ কথাগুলো বড্ডো রূঢ় শোনায়। তবে "স্বর্গভূমি" হোটেলের ম্যানেজার লোকটা ভালো। ওর গায়ের রং ভীষণ কালো। ঘাড়ে গর্দানে পুষ্ট মানুষ। শরীরে একরাশ থলথলে মাংস। আমার ওপর তার অপরিসীম স্নেহ।

রাস্তাটা ওয়ার্ড লেকের ঠিক পাশ দিয়ে, শিলং ক্লাবের গা ঘেঁষে, রাজভবনকে বাঁ ধারে রেখে নীচে নেমে গেছে। পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলে খানিকটা সমতল জমি। তারপর আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে যেতে হয়। রাজভবনের পাশের রাস্তার নাম ছিলো "ক্যামেলস্ ব্যাক্"। ললিতার অনুরোধে ও রাস্তার ওপর পাইনগাছের নীচে অপেক্ষা করতে হয়। ঘূর্ণি হাওয়াতে একরাশ ধূলোবালির সঙ্গে পাইনের শুকনো পাতাগুলো ঘুরপাক খায়। আমার মনের চিন্তাভাবনাগুলো ঠিক যেমন মনের ভেতর ঘুরপাক খায়। মুক্তোর মতো সাদা ধবধবে দাঁত বের করে ললিতা হাসে। গালে ওর রক্তিম আভা। প্লাম্, পিচ্, কমলালেবুর স্বাক্ষর। পাইন উড্ হোটেলে বীয়ারের গ্লাস ও আমার হাতে তুলে দেয়। গ্লাসে ঠোকাঠুকি আঙ্গুলে আঙ্গুলে ছোঁয়াছুয়ি হয়। ও আমাকে সব কিছু শেখাচ্ছে! অফিসের কেরানী আমি। প্রথম দিন ভেতরের সংস্কারগুলো ধাক্কা দিয়ে তরল পানীয়কে

ওপরে ঠেলে দিয়েছিলো। শার্ট প্যাণ্ট্ ভিজে গিয়েছিলো। কাশতে কাশতে অস্থির। নাকমুখ দিয়ে একরাশ জল। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। পাইন উডের সে ঠাণ্ডা পরিবেশ যেন এক লহমায় ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেলো। ফ্রেঞ্চ লেডী কেমন বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকায়। আমেরিকান মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি। লজ্জায় মরে যাই। একসময় পিসিমা নিমপাতা আর চিরতার জল খাওয়াতো। তখন কিন্তু এরকমটি হয়নি।

মরেলো হোটেলে ললিতা আমাকে জোর করে নাচের আসরে নামিয়েছিলো। তার আগে ললিতা আমাকে কয়েকদিন নাচ প্র্যাকটিস করিয়েছে। সমস্ত রকম কলাকৌশল শিখিয়েছে। ও হরি, নির্দিষ্ট সময়ে দেখি পায়ের গাঁটগুলো কে যেন বল্টু দিয়ে এঁটে দিয়েছে! এক পা নড়বার শক্তি নেই। কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে মার বুকে একাদন যেমন আশ্রয় আর নির্ভয় খুঁজেছিলাম, সেদিন ঠিক তেমনি ললিতার হাতের মুঠোয় নিজেকে সঁপে দিয়ে পাঁচ বছরের শিশু বনে গিয়েছিলাম। জোড়ায় জোড়ায় চোখ আমাকে যেন গিলে খাচ্ছে। কিন্তু নাচের পর আমার কি সম্মান। কর্ণেল সাহেব ঘন ঘন আমাকে সিগারেট দেয়। তেল কোম্পানীর ম্যানেজার আমার জন্যে স্যাম্পেন অর্ডার করেছে। স্টীল্ কোম্পানীর মালিক আমাকে গাড়িতে লিফট্ দিতে চায়। বুঝতে পারি ওদের উদ্দেশ্য আমার মাধ্যমে ললিতার নিকটে পৌছুনো। ওরা ললিতার মনের নাগাল পেতে চায়। ওটা যে কোথায় লুকোনো রয়েছে সে খোঁজ তারা রাখে না। তবে এ জানে যে এ ছোকরা বাজীমাত্ করেছে! আমার ওপর ললিতার এ কৃপাদৃষ্টির অর্থ ওরা খুঁজে পায় না। আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনে। "স্বর্গভূমি" হোটেলের ম্যানেজার বলে—"ললিতা তোমারে সোহাগ কইরা সুখশান্তি পায়। আর তোমারে খাতির কইরা বাকী সকলে সুখশান্তি পায়। একটা কাম্ করো দিকিন। অগো মাথায় হাত বুলাইয়া একটা ভালো কাম-কর্ম যোগাড় কইরা লও দিকিন্।

ললিতা চিরদিন থাকবো না। শিলং তোমার একসময় ছাড়তি হইতে পারে। চাকরিটা থাইকা যাইবো।" ম্যানেজারের কথাবার্তা যেন কেমনতরো। এখন বুঝি ম্যানেজার খাঁটি মানুষ ছিলো। ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো।

"স্বর্গভূমি" হোটেলে আমার থাকবার ঘরটা বড্ডো ছোটো। পঁয়ষট্টি টাকায় থাকা-খাওয়া। এ টাকায় এর চেয়ে বেশী আশা করা অন্যায়। ঘরে সূর্যের আলো ঢোকে না। চেষ্টা করে ঢোকবার পথ পায় না। কাজেই ঘরে অন্ধকারের রাজত্ব। কেমন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব। ইঁদুর আর আরশোলার উপদ্রব খুবই বেশী। মাছের কড়াতে ঝোল বলে যে বস্তুটি পরিচিতি লাভ করেছে তার চার ভাগের তিন ভাগই ছিলো খাঁটি কলের জল। একটুকরো মাছের খোঁজে গামছা পরিধান করে নেমে যাবার মতো অবস্থা। ললিতাদের প্রকাণ্ড বাড়ি। ওদের একখানা ঘরে গোটা মেসবাড়িটা পুরে রাখা যায়। ললিতার ওষ্ঠের মৃদু পরশে শাকচচ্চড়ী-পুষ্ট দেহটা থর থর করে কাঁপে। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই আমি "স্বর্গভূমির" বাসিন্দা। আমি যে সামান্য কেরানী, থাকা-খাওয়া বাবদ আমার যে মাসে মাসে পঁয়ষট্টি টাকা দিতে হয় সে সমস্ত বেমালুম ভুলে বসে থাকি। ওদিকে ললিতা যাদের সঙ্গে ঘুরছে, যাদের আদর-আপ্যায়ন করছে, যাদের সঙ্গে ডিনার ডান্সে যাচ্ছে তাদের অনেকে দশ-বিশ লাখের মালিক। কেউ মেজর নয় তো কর্ণেল। কেউ আবার বিরাট ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তখনকার দিনে শিলং ক্লাবে সমস্ত কিছুই এক ইলাহী ব্যাপার। টেনিস্ গল্ফ্ আর সুইমিং কম্পিটিশানে ভাগ নিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ওখানে ভিড় জমায়। শিলং ক্লাবের রিসেপসনিস্টরা বেশীর ভাগই মেয়ে। মেয়ের দল ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের স্নান করার আর খাবার সময় থাকে না। ললিতা ওদের একজন। সে মুক্তহস্তে অনুগ্রহ আর করুণা বিলোয়। অনুগ্রহ আর করুণার ভাগ বাঁটোয়ারার ভেতর আমার মতো নিরীহ গোবেচারা গোছের একটা লোক কি করে যে জুটে গেলো তা ভেবেই পাইনে।

হোটেলের ম্যানেজার ঠোঁটকাটা লোক। সে বলে—"পোলাউ মাংস আর কাটলেট্ খাওনের পর শুকতানি চাইখা দেখে।" দূর দূর ম্যানেজারটা একেবারে জংলী। কি যা-তা সব বলে। ললিতা ডাট্ থাকতো নঙ্‌থুমাই। তখন শিলং একেবারে ফাঁকা। আজকের মতো তখন সেখানে জনসমাগম হয়নি। লাইটুমুখরার পরের পাড়া নঙ্‌থুমাই। যেখানে ইউকলিপটাসের পাতা গন্ধ ছড়ায়। পাইনের হাওয়া কাঁপন ধরায়। নাস্‌পাতি, পিচ্ আর প্লাম্ রসে টুইটুম্বুর হয়ে গাছ থেকে ঝোলে। হাজারো পাকা কমলালেবু গাছে গাছে আগুনের রং ছড়ায়।

ক্যামেলস্ ব্যাক্ রোডের দুধারে ঝোপঝাড়। সেখানে বর্ণালী ফুলের মেলা। কতো ফুল কতো লতাপাতা। গ্লাডিওলি, কস্‌মস্, ডালিয়া, গ্লোরি অব রোম। ফরগেট্ মী নট, বুশেস্ অব ভারগো। ভায়োলা। আরো কতোরকমের ফুলের বাহার। পাহাড়ের গায়ে মাটি কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে ডন্‌বস্‌কো। বাঁদিকে আপ্‌ল্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলে সেণ্ট মেরী স্কুল আর কলেজ।—"ওই যে নাস্‌পাতির গাছটা দেখছো ওই গাছের ডাল বেয়ে লুসি ওপরে উঠে নাস্‌পাতি নীচে ফেলতো। আমি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থেকে ফল কুড়োতাম। একদিন গাছ থেকে লুসি পড়ে গিয়ে পায়ের হাঁটু ভাঙ্গল। লুসি তো হাসপাতালের বিছানায়। আমাকে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছুটির পর আটক করে রাখলে। খুব কেঁদেছিলাম। কিছুতেই ছাড়লে না। সারা স্কুল জনমানবহীন। নির্জন ঘরটিতে যখন অন্ধকার নেমে এসেছিল তখন এমন ভয় পেয়েছিলাম।" ললিতা তার শৈশবে ফিরে গেছে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ফ্রক পরা। দুধের মতো সাদা গায়ের রং, সোনালী চুলের ছোট্টো দুটি বেণী ঝুলিয়ে ছোট্টো মেয়েটি সেণ্ট্ মেরী স্কুলের প্রাঙ্গণে দৌড়ঝাঁপ করছে। ললিতা তার হাতের মুঠোর ভেতর আমার আঙুল চেপে ধরেছে। শিলং-এর হাওয়ায় কেমন একটা মাদকতা রয়েছে। শরীরে আর মনে এ কিসের চাঞ্চল্য! আমাদের পাশে একটা বড়ো মোটর এসে থামলো। শিলং ক্লাবের

হোমরাচোমরা কেউ হবে। ললিতাকে লিফট্ দিতে চায়।—"নো থ্যাঙ্কস্।" ছেলেটি মোটর হাঁকিয়ে যায়। ললিতা আমার সঙ্গ বেশী পছন্দ করছে।

লাইটুমুখরার পথে আলো জ্বলে উঠেছে। ওয়েস্ট এণ্ডের দোকানে ক্রেতার ভিড়। শিলং-এ সাহেবমেমদের ভিড়। সাহেবমেমরা কেনাকাটা করছে। ললিতার চালচলন অনেকটা মেমসাহেবের মতো। তা হবেই তো। মিশনারী স্কুলে পড়াশুনো করেছে। ভারতের বাইরে অনেক দেশ সে ইতিমধ্যে দেখে এসেছে। শিলং ক্লাবে সাহেবমেমদের মধ্যে ললিতা বেশীর ভাগ সময় কাটায়।

পথ চলতে চলতে ললিতা বলে—"জানো, আল্পস্ থেকে হিমালয় শ্রেষ্ঠ। হিমালয়ের বিরাটত্বের কাছে সহজেই মাথা নত হয়। মনকে করে উদার আর উদাস। মনের প্রসারতা বাড়ে। রাইন থেকে অনেক ভালো আমাদের গঙ্গা। পুণ্যবতী স্রোতস্বিনী সমস্ত ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। লণ্ডন থেকে ভালো বারাণসী। সমস্ত কিছু ভোগের পর ওর আকর্ষণ উপেক্ষা করা অসম্ভব।" আমি উত্তর দিই না। মনে মনে ভাবি ভূতের মুখে রামনাম। লাইটুমুখরার পাঁউরুটি আর কেকের দোকানের মালিক সেই সাহেব বুড়োটা বসে পাইপ টানছে। ওর বয়স আশীর ওপরে। রিন্‌জা বড়বাজারের খাসী ব্যবসায়ী। পুরোনো জিনিস-পত্র অক্‌সানে সেল করছে। দোকানের সামনে ছোটখাটো এক জনতা। হাতুড়ীর তিন ঘা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের মাল খালাস হচ্ছে। কাকতির বাড়ির পরদা হাওয়ায় উড়ছে। লাইটুমুখরার বাজারে খাসী মেয়েরা মাছ বিক্রী করছে। তারা পাইন গাছের কাঠে মশাল জ্বালিয়েছে—"ওই যে খাসী মেয়েটি মাছ বিক্রী করছে, ও আমার সঙ্গে স্কুলে পড়তো, নাম রিমি রিন্‌জা। বি-এ আর বি-টি পাস। দিনের বেলা কোনো স্কুলে পড়ায়। সন্ধ্যেবেলা মাছ বিক্রী করতে বাজারে চলে আসে।" তাকিয়ে দেখলাম। মেয়েটি সত্যি সুন্দরী। সুডৌল মণিবন্ধে রিস্টওয়াচের কালো ব্যাণ্ড এমন সুন্দর মানিয়েছে। বুঝলাম ওরা

শ্রমের মর্যাদা দিতে জানে। নঙ্থুমাই যাবার পথে লুমৌরী হিলের রাস্তায় সর্টকাট্ করি। ললিতা আরো ঘনিষ্ঠ হয়। যুগে যুগে অনেক প্রেমকাহিনী লেখা হয়েছে। রোমিও জুলিয়েট, মমতাজ শাহজাহান থেকে শুরু করে কলকাতার কালীঘাট পাড়ার খেঁদী আর পটলার সরস প্রেমকাহিনী পর্যন্ত অনেকের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর শেষ নেই। এ ভালো আমসত্ত্বের মতো। আমসত্ত্ব চুষে চুষে যেমন আমোদের শেষ নেই, প্রেমকাহিনীও তেমনি। যত শুনবে ততই মজা। শ্রোতা নেশায় বুঁদ্ হয়ে পড়ে থাকে। আমার প্রেমকাহিনীর সবটা শোনাবার মতো সময় আর ধৈর্য আমার নেই। আমি জানি পাঠকের র‍্যাশন্ আনতে হবে। ইনকাম্ ট্যাক্সের অফিসে ছুটতে হবে কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে। মেয়েদের ছুটতে হবে শাড়ি ব্লাউজের দোকানে। টোয়েন্টি পার্সেন্ট্ রিডাক্সান্ সেল দিচ্ছে। দু-একখানা শাড়ি বগলদাবা করতে হবে। সবাইকারই সময়ের অভাব। তাই আমার গল্পের শেষ চ্যাপ্টারটাই শোনাবো। ঘোরতর ট্র্যাজেডি।

"স্বর্গভূমি" হোটেলের কামরায় রয়েছি আমি আর ললিতা। আমি নীল সাগরের অতল তলে ডুবতে থাকি। ডুবি আর ডুবি। হোক না আমার ঘর এতোটুকুন একটা খুপরি, দিনের বেলা একফোঁটা সূর্যের আলো যেখানে প্রবেশ করে না। তাতে ক্ষতি কি ? কাঠের মেঝে ফাঁক হয়ে গেছে। আর তাই দিয়ে শীতের হাওয়া এসে হাড়ে কাঁপন ধরায়।

জানলার কাঁচ ভাঙা। সেখানে কাগজ গোঁজা হয়েছে। একটা ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে চার ফুট মতন উঠে আমার ঘরে পৌঁছুনো যায়। ভ্যাপসা গন্ধে দম আটকে আসে। এ মুহূর্তে আমি সেসব কিছুর জন্যেই ভাবছিনে। ললিতা থাকে নঙ্থুমাই যেখানে ইউকলিপটাস্ গাছের পাতা গন্ধ ছড়ায়। পাইনের শুকনো পাতা পথ পিচ্ছিল করে। শিলং ক্লাবের ইন্‌ফেন্‌ট্রির মেজর যার ইয়া বড়ো গোঁফ। চক্ষু যার সর্বক্ষণ রক্তবর্ণ। আমাকে আর ললিতাকে সে এখন এখানে দেখলে

হুকুম ছাড়তো—"এ্যাটেন্সন্ ! কুইক্মার্চ ! ফায়ার !" মেজরের মুখে সর্বক্ষণ ওসব কথা লেগেই আছে। মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেজর হোটেলের এ ঘরে আমাদের দুজনকে দেখলে নির্ঘাত রিভলবারটা আমার দিকে তাক্ করে ছুঁড়তো। শিলং ক্লাবে ললিতার পা মাটি ছোঁয় না। এখানে আমার ঘরে ললিতা যেন নববধূ। মনে হয় গাঁয়ের শীতল পুষ্করিণীতে স্নান সেরে সারা অঙ্গে স্নিগ্ধতার প্রলেপ নিয়ে এখানে চলে এসেছে। ভুলতে পারিনে চেরাপুঞ্জীতে মেঘ আর ফগের মধ্যে আমাদের লুকোচুরি খেলা। মাফ্লং-এ উঁচু টুলের ওপর বসে রাম-ভর্তি গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়ানো। ললিতা লেখাপড়া জানা মেয়ে। সে আমাকে জয়ন্তিয়া নীতিকথা শুনিয়েছে। একটি নীতিকথা আমার এখনো মনে আছে।—"মাটির ওপর ধান চাল রয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষ আকাশের দিকে তাকায়।" নঙ্ক্রেমে খাসীদের নাচে আমি আর ললিতা ভাগ নিয়েছি। ললিতা শুনিয়েছে খাসীদের ইতিহাস। ওদের সঙ্গে অস্ট্রিক্ গোষ্ঠীর লোকদের সাদৃশ্য আছে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের কতোগুলো জাতির ভাষার সঙ্গে খাসী আর ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ভাষার মিল রয়েছে। ওরা বিরাট অস্ট্রিক্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

আমার ঘরের খাটটার পা নড়বড়ে। টেবিলটার বার্নিশ নেই। এখান থেকে গল্ফ্ ফিল্ড দেখা যায়। সাহেবমেমরা গল্ফ্ খেলছে। জয়ন্তিয়া ছেলেরা তীর ধনুক নিয়ে খেলা করছে। ঘাড়েগর্দানে পুষ্ট ম্যানেজার তার ঘরে বসে বাজারের হিসেব মিলোচ্ছে। তার একটা চোখ রান্নাঘরের দিকে। ইদানীং কাঠ আর কয়লা বড্ডো চুরি হচ্ছে। ম্যানেজার ললিতার আগমনবার্তা টের পেয়েছে। সে ভারী খুশী। তার "স্বর্গভূমিতে" দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। মেমসাহেব লক্ষ্মী তার হোটেলে। এ কি তার কম সৌভাগ্য ! এখানকার বাসিন্দা বলতে ও ধরনের সব লোক যারা মনোহারী দোকান চালায়। নয়তো কেরানী। নয়তো মেডিক্যাল এজেন্ট। আমার কল্যাণে হোটেলের প্রেস্টিজ বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। ম্যানেজার বয় মারফৎ ইতিমধ্যে চা আর কেক

পাঠিয়েছে। এ হোটেলে কেক আমি এই প্রথম দেখলাম। ললিতা খেয়ে বলেছে—"হাউ নাইস্!" আমি জানি রাত্রে আমার পাতে একটুকরো মাছ বেশী পড়বে। খানিকটা মাংসের ঝোল পথ ভুল করে আমার প্লেটে চলে আসতে পারে। ম্যানেজার হোটেলের পাবলিসিটি চায়। ললিতা কেক আর চা খেয়েছিলো। হোটেলের যথেষ্ট প্রশংসাও করেছিলো। তারপর যে প্রস্তাব সে এনেছিলো তা শোনার পর আমার মুখে ভাষা যোগায়নি। আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়েছিলাম। কেমন হতভম্ব হয়ে বসে ছিলাম। কেক চা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। ললিতা আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। একটা কথা সে আমাকে সোজাসুজি বলেছিলো। তার পেটে নাকি সন্তান এসেছে। সেই সন্তানের দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। সন্তানের পিতা নাকি সম্প্রতি ভারতের বাইরে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। জানিনে কতোটা সত্যি। ললিতা সন্তান চায়। আমাকেও চায়। আমি দুজনের দায়িত্ব নিতে রাজী কিনা সে সেটা জানতে চায়। আমি কিন্তু এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করি। ললিতা যাবার সময় বলে—"ব্রুট্"। বুঝতে পারিনে দোষ আমার না যে মারা গেছে তার! এর পরে ললিতাকে আমি এড়িয়েই চলি। ওর সঙ্গে দেখাশুনো বন্ধ করি। মাস তিনেকের ছুটিতে শিলং ছেড়ে চলে এসেছিলাম এবং তারপর আর শিলং যাইনি। এর পর অনেক বছর পরে আবার ললিতাকে নেফায় পাশিঘাটের এয়ার-ফিল্ডে দেখলাম। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি প্লেন উড়বার জন্যে প্রস্তুত। ললিতা আর ওর স্বামী প্লেনে উঠছে। শিশু-সন্তানের কি হলো জানবার আগ্রহ আমার নেই। ললিতা ডাট্ আজকে হয়তো আর ডাট্ নেই। অন্য পদবী নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

॥ চার ॥

পলিটিক্যাল অফিসের চক্রবর্তী। সামনের কয়েকটা দাঁত নেই। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পঞ্চাশের ঘরে বয়স। গায়ের রং কোনো এক সময় যে পরিষ্কার ছিলো তা এখনও বোঝা যায়। আমার পাশিঘাট পৌছবার পর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যের সময় চক্রবর্তী ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলোতে এসে উপস্থিত হয়। চক্রবর্তী নেফাতে কাজ করছে অনেকদিন। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। নেফা সম্বন্ধে তার অনেক অভিজ্ঞতা। নেফা সম্বন্ধে সে অনেক কথাই শুনিয়েছিলো, পুরানো দিনের গল্প। চক্রবর্তী টিরাপ সীমান্তের ট্যাংছা ট্রাইব সম্বন্ধে বলেছিলো। শত্রুর মুণ্ড কেটে আনার সঙ্গে নাকি শস্যক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। লোহিত ডিভিসানের মিস্‌মী মেয়ে স্বামীর বিশ্বাস হারালে তার নাকি হাতের একটি আঙ্গুল সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জন দিতে হয়। শুনিয়েছিলো টিরাপের সিংফোদের কথা। অনিচ্ছাকৃত সন্তানের দায়িত্ব বাপকে হাসিমুখে নিতে হয়। মেয়েকে বিয়ে করা বা না করা প্রেমিকের ইচ্ছার ওপর। শুনিয়েছিলো সুবনসিরির ডাফ্‌লা আর টাগিনদের কথা। বাইরের লোককে সহজে ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। ডাফ্‌লা ছেলেমেয়ে যদি স্বপ্ন দেখে যে তার আঙ্গুল কেটেছে তবে সে তার আশেপাশের কোনো মানুষের মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়। কে মরবে তা ভাবতে বসে। সিয়াং ডিভিসানের উত্তর অঞ্চলে গালং-দের বাস। সিয়াং ডিভিসানের দক্ষিণে পাশিঘাটের আশেপাশে আদিদের বাস। ডিভিসনাল্‌ হেড কোয়ার্টার্স আলং। গালংদের ভেতর পাঁচ ভাই-এর এক স্ত্রী হতে পারে। অথবা প্রত্যেক ভাই-এর স্ত্রীর ওপর অন্য ভাইদের যৌন অধিকার থাকে। কিন্তু সন্তানের জন্য দায়ী থাকবে সেই ভাই যে মেয়েটিকে বিয়ে করে এনেছে। যাক। এবার চক্রবর্তী মশাই-এর কথা বলি। চক্রবর্তীর অনেক অভিজ্ঞতা। কতো পলিটিক্যাল অফিসার এলো আর কতো গেলো তা আঙ্গুল গুণে চক্রবর্তী বলে দিতে পারে। সাহেব, অসমীয়া, বাঙালী, লুসাই, নাগা।

সমস্ত অফিসারদের নাম চক্রবর্তীর কণ্ঠস্থ। চক্রবর্তী সেলাম ঠুকে আর সাহেবদের মন জুগিয়ে টিকে রইলো। নেফার পাঁচটি ডিভিসানের সব খবর চক্রবর্তীর নখের ডগায়। পাশিঘাটের অফিসার ক্লার্কদের বাড়ির বন্দোবস্ত চক্রবর্তীকে করতে হয়। অফিস আর বাড়ির ফার্নিচারের হিসেবনিকেশ রাখতে হয় চক্রবর্তীকে। পাশিঘাটে সপ্তাহে একবার প্লেন নামে।

প্লেনের সরকারী, বেসরকারী মালপত্তরের খবরদারি চক্রবর্তীকেই করতে হয়। পাশিঘাট থেকে প্লেন এয়ার-ড্রপিং-এ গেলে চক্রবর্তীরই সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতে হয়। এ ছাড়া অফিসারদের গৃহে ডিনার আর পার্টির সমস্ত বন্দোবস্ত তাকেই করতে হয়। এর ওপর রয়েছে অফিসারদের বউদের ফরমাশ। তাদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। তাদের খুশী রাখতে হয়। জিজ্ঞেস করি—"আমার বাড়ির কি হলো ?"

একগাল হেসে চক্রবর্তী বলে—"হবে। বাড়ি হবে।" তারপর একটু থেমে বলে—"পাশিঘাটে আর ক'টা বাড়ি রয়েছে! কাঠের তৈরী বাড়ির সংখ্যা হাতে করে গোনা যায়। বাদবাকী সব বাঁশের তৈরী।"

—"বাঁশের বাড়ি !"

—"হ্যাঁ তাই। শীতকালে বাঁশের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপিয়ে ছাড়ে। বর্ষাকালে জল চুঁইয়ে পড়ে। মাটি থেকে জোঁক আর অন্যান্য পোকামাকড় উঠে আসে। তবু ওই বাসাবাড়িরই জন্যে কতরকম অনুরোধ। টিরাপের চ্যাংলা আর খোন্‌সা। লোহিতের তেজু আর রোয়িং। সুবনসিরির জিরো। কামেং-এর বুড়ো গাঁও আর বম্‌ডিলা থেকে লোক পাশিঘাটে বদলি হয়ে এসে বাড়ির জন্যে এমন জ্বালাতন শুরু করে যে জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। তা আপনার বাড়ির অভাব হবে না। ব্যবস্থা একটা ঠিক করে দেবো।"

প্রশ্ন করি—"আপনি কতোদিন ধরে নেফাতে রয়েছেন !"

—"সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। পাশিঘাটে তখন জঙ্গল আর জঙ্গল। নেফা সম্বন্ধে লোকে আর কতোটুকুন জানতো। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারের নেফার ওপর নজর পড়েছে। পরিবর্তনও খুব দ্রুত হচ্ছে। নেফা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগুচ্ছে।"

—"আমাকে এই নির্জন বাংলোতে কতোদিন এরকমভাবে থাকতে হবে বলতে পারেন?"

—"কেন ভয়টয় পেয়েছেন নাকি?"

—"নিশুতি রাতে বাংলোর আশেপাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেউ কাঁদে! কে কাঁদে বলুন দেখি?"

—"ওমি ময়াং হবে।" নির্বিকার কণ্ঠে বলে চক্রবর্তী।

—"ওমি ময়াং! সে কে?"

—"আমাদের পুরোনো চৌকিদারের ভাগনে। ওর কান্নাই শুনেছেন বোধ হয়।"

—"ওরকম ভাবে কাঁদে কেন?"

—"ওমি ময়াং-এর বৌ নেনী ময়াং ওই সিয়াং নদীর জলে ডুবে মরেছে। তারপর থেকেই ওর মাথার গোলমাল। আর ওর মৃত্যুর পর ওমি ওরকমভাবে কান্নাকাটি করে। ও বলে নেনীর আত্মা না কি সিয়াং-এর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। ইন্‌স্‌পেক্‌সন্‌ বাংলোর আশেপাশে নেনীকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে বলে কেউ কেউ বলে থাকে। ওমি ময়াং জোর গলায় তাই বলে।"

—"বিশ্বনাথ নন্দী তাহলে নেনী ময়াং-এর কথাই শুনিয়ে গেছে!" আমি বলি।

—"বিশ্বনাথ নন্দী তাহলে সব কিছু আপনাকে শুনিয়েছে? তবে ভয় পাবার কিছু নেই। নেনী কারো কিছু ক্ষতি করে না। শুনতে পাই নেনীর আত্মা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তবে আমি কখনো দেখিনি।" বলে চক্রবর্তী।

—"আপনারা বেশ লোক মশাই। একজন বলে গেলো রাতের

বেলা ঘুমুতে ঘুমুতে চোখ কান খোলা রাখতে। সিয়াং যে কোনো মুহূর্তে ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলো গ্রাস করতে পারে। অনেক খেয়েও তার ক্ষুধা নাকি যায়নি। আর আপনি বলছেন এখানে রাতের বেলা অশান্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়। ব্যাপার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার।"

চক্রবর্তী জিভটা দাঁতের ফাঁকে ঠেলে দিয়ে কেমন চুক্‌ চুক্‌ করে শব্দ করে আর হাসে, অদ্ভুত হাসি।

—"সিয়াং-এর জলোচ্ছ্বাস বন্ধ করবার জন্য আর নেনী ময়াং-এর আত্মার সদ্‌গতির জন্যে ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোতে আমরা ক'জন মিলে নামকীর্তনের বন্দোবস্ত করেছিলাম। দেব-দেবীর দু'চারখানা ফটো, ধূপ, ধূনো, ফুল-বেলপাতা, বাতাসা, মিষ্টি, ফল সব কিছুরই বন্দোবস্ত হয়েছিলো। কীর্তন গাইবার জন্যে লোক এনেছিলাম তিনসুকিয়া থেকে। পুরোহিত আমি। এদিক ওদিক থেকে দু'চারজন লোকও জড়ো করেছিলাম। সেদিন ছিলো অমাবস্যা। তার ওপর ঝড়-বাদলার রাত। সিয়াং নদী বড্ডো বেশী পাগলামি করছিলো। পাশিঘাটের পথে কোনো আলোর বন্দোবস্ত নেই। এমনিতে পাশিঘাটে জেনা-রেটার বসিয়ে সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌনে আটটা পর্যন্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন আবার জেনারেটার মোটেও চলেনি, ঘুটঘুটে অন্ধকার। নামকীর্তন হলো। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। চাদর আর কম্বল মুড়ি দিয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোর বারান্দায় সব বসেছে। বারান্দার ধারে বাংলোর সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে। নেমে গেছে সিয়াং-এর ধার পর্যন্ত। সিঁড়ির ওপরের ধাপগুলোর ওপর লোকজন বসেছে। কীর্তন শেষ হলো। এবার প্রসাদ বিতরণের পালা। আমি অন্ধকারের ভেতর প্রসাদ বিতরণ করছি। সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে চাদর জড়িয়ে একজন বসে আছে। তাকে বার বার প্রসাদ নিতে বলি, লোকটি কোনোরকম শব্দ করে না। হাতও বাড়িয়ে দেবে না। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে গেলে তবে তার কাছে পৌঁছানো যায়। সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা নেমে গিয়ে লোকটিকে প্রসাদ নেবার জন্যে হাত বাড়াতে

বলি। হাত আর সে কিছুতেই এগিয়ে দেয় না। লোকটা কি ঘুমিয়ে পড়লো? অনেক রাত হলো, লোকটার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? এত মেহনত গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, প্রসাদ নিয়ে এখন আমাকে মুক্তি দিক।" চক্রবর্তী পা তুলে বসেছে। আবহাওয়া গল্প বলার এবং শোনার সম্পূর্ণ উপযোগী। চক্রবর্তী আবার শুরু করে।—"আমার একটু বিশ্রামের দরকার। ততোক্ষণে আমার বেশ রাগ হয়েছে। ভাবলুম প্রসাদটা ওর মুখেই তুলে দেবো। হাতটা বাড়িয়েছিলাম। বিরাট একটা জিভ এসে গোটা হাতখানা চেটে দিলে। সমস্ত কিছু বুঝে ওঠবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। অজ্ঞান হবার আগে খানিকটা নজরে এসেছিলো। ডোরাকাটা বিরাট এক বাঘ। অন্যের মুখে শুনেছি যে আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পরই বাঘটা ধীরেসুস্থে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাংলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। সিয়াং-এ ঢল নেমেছিলো। বাঘটা জলের তোড়ে ভেসে এসে ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোর আশেপাশে আশ্রয় খুঁজেছিলো।"

ঠাট্টা করে বলি—"আপনাদের কীর্তন বোধ হয় ওর খুব ভালো লেগেছিলো!"

জিভ দাঁতের ফাঁকে ঠেকিয়ে চুক্‌ চুক্‌ করে শব্দ করে হাসে চক্রবর্তী।—"তা হয়তো হবে। পরম ভক্তি নিয়েই ও কীর্তন শুনছিলো। কাউকে কিছু বলেনি।"

—"তা চক্রবর্তী মশাই, আজ সারাদিন চৌকিদারের কোনো পাত্তা নেই, গত কালও ওর পাত্তা মেলেনি, কি করি বলুন দেখি?"

—"খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছে?"

—"তা হয়েছে। বিশ্বনাথ নন্দী বিকেলবেলাই টিফিন কেরিয়ারে খাবার ভর্তি করে পাঠিয়েছে।"

—"চৌকিদারটাকে নিয়ে খুবই মুশকিলে পড়েছি।"

—"কি রকম?" প্রশ্ন করি।

—"পাশিঘাটের ডি. সি. মানে ডেপুটি কমিশনার গেছেন শিলং।

তাঁর বাড়ি পাহারা দেবার জন্য রাতের বেলা চৌকিদারকে রেখেছিলাম। সব বুঝিয়ে বাংলোতে রেখে আমি চলে এসেছিলাম। ভোরবেলা গিয়ে দেখি সে এক বিশ্রী ব্যাপার।"

—"কি দেখলেন?" প্রশ্ন করি।

—"ডি. সি-র বাংলোর ঘরে আর বাইরে একখানা কাঁচও অক্ষত নেই।"

—"সে কি মশাই!"

—"সত্যি বলছি মশাই। সমস্ত কাঁচ গুঁড়ো-গুঁড়ো, আর তার জন্যে দায়ী আমাদের চৌকিদার বাবাজী।"

—"কাঁচ ভাঙ্গার রহস্যটা খুলে বলুন দেখি!"

—"চৌকিদার প্রচুর মদ্যপান করে বাংলো পাহারা দিচ্ছিলো। কাঁচের ভেতর যখুনি সে নিজের ছায়া দেখেছে তখুনি অন্য লোক বাংলোতে ঢুকেছে মনে করে তাকে পিটিয়ে বের করতে গেছে। আর তাতে ওই অবস্থা। একটি একটি করে সমস্ত কাঁচ গুঁড়ো করেছে। ওর ধারণা প্রতিপক্ষর সবাইকে মেরে সে শেষ করেছে। ওদের সাহস দেখে সে অবাক বনেছে। ডি. সি-র বাংলোতে প্রবেশপত্র ছাড়া ঢুকেছে। ডি. সি-র সমস্ত ঘরের চাবিগুলো ওকে দিয়ে এসেছিলাম। কথা ছিলো ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখবে। এখন বলুন দেখি ডি. সি-র কাছে আমি কি করে মুখ দেখাই? ওর চাকরি থাকবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে ডি. সি. আমার ওপর চটবে। হয়তো বদলি করে দেবে নেফার অভ্যন্তরে অন্য কোনো জায়গায়।" চক্রবর্তী কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে। প্রবলেম গুরুতর সন্দেহ নেই।

—"না না, কিছু হবে না।" সান্ত্বনা দিই আমি। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর একসময় আমি বলি।

—"আপনি এর আগে কোথায় ছিলেন?"

—"লোহিত ডিভিসানে।"

—"নেফাতে কতোদিন ধরে আছেন?"

—"তা বছর ত্রিশের ওপর তো হবেই। দেশ স্বাধীন হবার আগে সাহেবদের সময় থেকে রয়েছি।"

—"নেফা সম্বন্ধে আপনি অনেক কিছু জানেন?"

—"দেখুন নেফা সম্বন্ধে এখনো মানুষ কতোটুকুন আর জানে। কামেঙ্ ডিভিসানে বারো আর চৌদ্দ হাজারের ওপর সব পর্বত রয়েছে। তাদের চূড়ো সব বরফে ঢাকা। সুবনসিরির দুর্ভেদ্য অরণ্য। টিরাপ সীমান্ত যেখানে ব্রহ্ম সীমান্তে মিশেছে সেখানে ঢুকতে এখনো বুক টিপটিপ করে। স্বাধীনতার আগে সাহেবদের সঙ্গে নেফা অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। তারা লোহিতের ওয়ালাং-এর পথে চীনের দিকে চলে যেতো। আর যেতো কামেঙ্-এর টোয়াং দিয়ে তিব্বতের দিকে। দুষ্প্রাপ্য গাছপালার সন্ধান করতো। অর্কিডের ওপর ছিলো ভয়ানক লোভ।"

—"আপনি কি করতেন?"

—"আরে মশাই ওরা এক্সপিডিসানে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে এ শর্মার খোঁজ পড়তো। পোর্টার চাই। তিব্বতী নয়তো খামতী। পাসপোর্ট যোগাড় করা। পোর্টারদের মজুরী নিয়ে দরকষাকষি করো। তাছাড়া ট্রাইবসদের সব উপহার দিতে হবে। কাঁচ আর পাথরের মালা। গ্রামোফোন, চা, চিনি, নুন। এ ছাড়া রয়েছে এয়ার-ড্রপিং। কুয়াশায় ঢাকা সব পাহাড় আর পর্বত। তার ভেতর দিয়ে ভাঙ্গা সব প্লেন নিয়ে উড়ে গিয়ে ফুড আর নানারকম জিনিসপত্তর এয়ার ড্রপ করা।"

—"ভয় করতো না?"

—"করতো না আবার! প্লেনগুলো ছিলো ভাঙ্গাচোরা। মালপত্তর ফেলবার সুবিধের জন্যে প্লেনে দরজার বন্দোবস্ত রাখা হয়নি। সেখান দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসতো। বাঁশ ধরে প্লেনের ভেতর দাঁড়াতে হতো। একবার তো মালপত্তর ফেলতে গিয়ে মালের সঙ্গে নিজেই চলে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ সঙ্গের একজন প্যাণ্টলুনের

পায়ের দিকটা টেনে ধরে আমার গতিরোধ করেছিলো! নইলে হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। এ শর্মাকে আর আপনার জন্যে বাড়ি খুঁজতে হতো না। এয়ার-ড্রপিং-এর সময় প্লেনের ভেতর চট দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা শুয়োর আর ভেড়ার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থাকতে হয়েছে।"

—"ভালো লাগে এ চাকরি আপনার?"

—"প্রথমে লাগতো না। শেষে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো। নেফার এ উত্তেজনা কোথায় পাবো? প্লেন্সের চাকরি কেমন যেন বিস্বাদ আর জলো মনে হয়। ডালহৌসী স্কোয়ারে সেই দশটা-পাঁচটার চাকরি। টিফিনের সময় ছোলাভাজা আর বাদাম চিবানো, আর ভাঁড়ের চা। লোক আর লোক। মেপে মেপে খাওয়া। তারপর টক্ ঢেঁকুর। বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবুর মুখখিঁচুনি। এখানে খুব একটা বড়ো চাকরি কিছু করিনে। কিন্তু ভাবুন দেখি পলিটিক্যাল অফিসার গায়ে হাত বুলিয়ে কাজ আদায় করে, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিসের কমাণ্ডার বাসাবাড়ির জন্যে আমার হাতটা চেপে ধরে, বিহার মিলিটারী পুলিসের জমাদার তাদের কোয়ার্টার্সে আয়োজিত খানাপিনাতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে। আসাম রাইফেলস্-এর মেজর ভালো মদ আমার গ্লাসে ঢেলে দিয়ে বলে—'চক্রবর্তী, রাত্রে ডান্স্ আছে। চলে এসো।' বলে আমার পিট চাপড়িয়ে দেয়। তাই বলছিলুম স্যার, নেফার এ উত্তেজনা, এ আনন্দ কোথায় পাবো? জানি সামনে বিপদ। পেছনে বিপদ। কিন্তু সম্মান আছে এখানে। এখানে বেঁচে আছি বলে মনে হয়। আপনাদের শহরগুলোতে লোকগুলো বেঁচে থাকে না। ঝিমোয়। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এক সময় মরে যায়।"

—"লোহিত ডিভিসান সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

—"ওই মিস্‌মী পাহাড় এলাকায় ছিলাম। আজকাল যাকে আপনারা লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিসান বলেন। গেছি সদিয়া থেকে ওয়ালাং।" লোহিতের গল্প শোনায় চক্রবর্তী, "লোহিতের অধিবাসী

মিস্‌মীরা তিব্বেতো-বার্মান বংশোদ্ভূত। মিস্‌মীদের ভেতর তিনটে ভাগ। টান, মারা এবং মিজ্ঞা। শোনায় ইহু মিস্‌মী আর কামান মিস্‌মীদের কথা। দিগারু মিস্‌মী নেফার একমাত্র জাত যারা হাতে মুখে অঙ্কনবিদ্যার কৌশল দেখাবার আগ্রহ প্রকাশ করে না। আর পান খায় না। ইহু মিস্‌মী নাকি চমৎকার কাপড় বোনে। তাঁরাও অথবা দিগারু মিস্‌মীদের পুরুষদের চুল মাথার ওপর ঝুঁটি করে বাঁধা। ইহু মিস্‌মীরা নাকি ঝগড়াঝাঁটি আর যুদ্ধবিগ্রহের খুব ভক্ত ছিলো। কথায় কথায় বিষাক্ত তীর ছুঁড়তো।"

—"মিস্‌মীরাও নিশ্চয় আদিদের মতো অনেকরকম দেবদেবীর পূজো করে?" একসময় চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করি।

—"মিস্‌মীদের প্রলয়ের দেবতা হলো মুজি ডাগ্রাহ। শিকারের দেবতা ডানি পাঁও। সম্পত্তি আর রোগের দেবতা টাব্‌লা।"

—"আপনি ওয়ালাং-এর পথে নিশ্চয় যাতায়াত করেছেন?"

—"তা তো করতেই হয়েছে। সদিয়া থেকে ওয়ালাং। কুণ্ডল নদী কি কষ্ট করে না পার হয়েছি। মিস্‌মী ছোক্‌রার পাঁচটা বৌ। যে যতোটা বিয়ে করবে তার ততো প্রতিপত্তি। ছোক্‌রা সারাদিন তামাক টেনেছে। নিজে ভীষণ কুঁড়ে। পাঁচটা বউ অনবরত খেটেছে।"

হেসে বলি—"আমাদের আর সে সৌভাগ্যই হলো না!"

চক্রবর্তী বলে চলে, "তারপর শুনুন না?"

—"বলুন।"

—"বউ নিয়ে ছোক্‌রা আমার পাশে শুয়ে পড়লো, পাঁচটা বৌ আমার পাশে। আমি লজ্জায় লাল। সাহেব দুটো খুব খুশি। বলে, 'ক্যারি অন্ চক্রবর্তী।' এর পর তেজুতে থামলাম। ডান হাতে পরশুরাম কুণ্ড। হিন্দুদের মস্ত বড় পবিত্র তীর্থস্থান। অন্য রাস্তা ধরে ঘন বন পার হয়ে ২০০০ ফিট উঠে ডেন্‌নিঙ্। কি বৃষ্টি কি বৃষ্টি! চেরাপুঞ্জীকে হার মানায়। রাতের বেলা মিস্‌মী পোর্টাররা মাংসের জন্যে মিথুন মারলে। নাচ, গান, মদ্যপান, হৈ-হুল্লোড়। সাহেব দুটো

মদ টেনে বেহুঁশ। মিস্‌মী ছোক্‌রার পাঁচ বৌ। একটা বৌকে অন্য জায়গা থেকে ফুসলিয়ে এনেছে। স্বামী ছাড়বে কেন? ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মিথোন চেয়েছে। সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া মিথোন কেটে এ উৎসব।"

—"মেয়েগুলো আপনাকে জ্বালালে বুঝি?"

—"আর বলবেন না। ব্রাহ্মণ সন্তানের চেহারাখানা খারাপ ছিলো না। আমার হাত ধরে এই টানাটানি। মেয়েগুলোর চেহারা ভালো। কিন্তু গায়ে কি ভীষণ বোঁটকা গন্ধ। মাসে একবার স্নান করে কিনা সন্দেহ। মাথাভর্তি উকুন। এ ওর মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে। ছেলেমেয়ে সবাই চুরুট টানে। রাতদিন টানছে। একটি মেয়ে যখন আমার হাত ধরে টানাহেঁচড়া করছে তখুনি লক্ষ্য করলাম—"

—"কি লক্ষ্য করলেন?"

—"দেখলাম হাতের দুটো আঙুল নেই। এরকম আরো কয়েকটি মেয়ের হাতের আঙুল নেই দেখলাম। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম স্বামীর বিশ্বাস হারালে আর অন্য লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করলে, হাতের আঙুল বিসর্জন দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়।"

—"যাক, ভাগ্যিস মেয়েটি আপনার জন্যে তৃতীয় আঙুলটি হারায়নি!" ঠাট্টা করে বলি আমি।

—"এর ভিতর শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি। আর ওরা শুরু করলো মুজি ডাগ্রাহব পূজো। উনি ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টির দেবতা। এর পর হেরুলিয়াং। কি কুয়াশা! বাপ্, টিড্‌ডিং-এ ৬০০ ফিট ওপরে সাদা বরফের স্তর। মিস্‌মীদের সমাজ সিয়াং-এর আদিদের মতো সমষ্টিমুখী নয়। মিস্‌মীদের জীবনে গ্রাম বা গ্রামসভা বড়ো নয়। ঘর তাদের সর্বস্ব। পাহাড়ের ওপর ঘরগুলো। হেলে রয়েছে। সাধারণতঃ বাট ফিট লম্বা। ভেতরে করিডর রয়েছে।" মন দিয়ে শুনেছি চক্রবর্তীর কথা, চক্রবর্তীর নেফা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা।

—"এর পর বারো-চোদ্দ হাজার ফিট সব পর্বত অতিক্রম করতে হয়েছে। নদীগুলোতে সব বাঁশ আর বেতের সাঁকো। লোহিত, ডিগারু,

কুণ্ডিল পানী। কামলাং পানী, বেরেং ধৌত লোহিত সীমান্ত বড়ো মনোরম। কুণ্ডিল নগর, শিশুপাল নগর, ব্রহ্মপুত্র বা পরশুরাম কুণ্ডর প্রদেশ সারা ভারতের লোক জানে। লোহিতে থাকে মিস্‌মী, পাদাম, খামটি আর সিং ফো জাতীয় লোক। খামটি আর সিংফোরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। খামটিরা নিজের ভাষা, ব্রহ্মদেশের আর অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করে। খামটি ভাষা ইন্দোচীন ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত। এর পর গেছি মাছিমা, হাই উলিয়াং, প্যাং গং, চ্যাং উনটি আর মিংজং। এর পর সেট্‌টি থেকে ওয়ালাং। চৌদ্দ হাজার ফুটের ধাক্কা। বরফ আর বরফ।"

—"মিস্‌মীদের কথা আমরা কবে জানতে পারি?"

—"বাঙলা রেকর্ডে মিস্‌মীদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন লেফটেনান্ট বরলান্ট ব্রহ্মপুত্রের উত্তরদিক আবিষ্কারে মত্ত।" চক্রবর্তী থেমেছে।

—"শীগগির বাড়ি পাবো তো?"

—"বাড়ি পেয়ে যাবেন। টেণ্ডার কল করেছি। তিনসুকিয়া আর ডিব্রুগড় থেকে মিস্ত্রী আসছে। ইনার লাইনের জন্য সব গোলমাল। নেফা এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ আলাদা। পাস আর পারমিট ছাড়া কেউ নেফাতে ঢুকতে পারে না। মালপত্তর পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যায়। বর্ষাকালে নেফার অনেক স্থান বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাইরের লোক এসে অবাধে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে না। সব কিছুর জন্যে ছোটো নেফা হেড কোয়ার্টার্স শিলং-এ। না, অনেক কথা বললাম এবার ফার্নিচারের লিস্টটা তৈরী করে ফেলতে হয়।" চক্রবর্তী নাকের উপর চশমা তুলে লিস্ট কমপ্লিট করতে শুরু করে। একসময় আমার দিকে চেয়ে বলে—"তবে নেফা আর সে নেফা নেই। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সবাইকার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার জন্য নেফা প্রস্তুত হচ্ছে।"

॥ পাঁচ ॥

পাশিঘাটের ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোতে কয়েকদিন কাটাতে হয়েছে। তৃতীয় রাতেও বড্ডো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিলো।

ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোর দরজা-জানালা ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে থাকে। সিয়াং-এর সেদিন বড্ডো ভয়ঙ্কর চেহারা, হাওয়ায় ছিলো সাংঘাতিক তেজ। বৃষ্টি এসে তীরের মতো শরীরে বিঁধতে থাকে। দরজায় আবার সেই করাঘাত। হ্যারিকেনটা একরাশ ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে থাকে। বৃষ্টি বাদল, মেঘ আর বিদ্যুৎ-এর ভেতর সেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। কাঁদে আর কাঁদে। সিয়াং গর্জাচ্ছে। দূরে পাহাড়গুলো অস্পষ্ট। এ অন্ধকারে কে কাঁদে ? আজও বাংলোর চৌকিদার নেই। বিশ্বনাথ নন্দী আর চক্রবর্তী যেসব কাহিনী শুনিয়ে গেছে ! সারা বাংলোতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। দরজার কড়া কে যেন ঘন ঘন নাড়ছে। অনেক কণ্ঠের ফিসফিসানি। মনে মনে ভাবি ওসব হাওয়ার কারসাজি। কালকে ভোরেই পালাবো এখান থেকে। কার সহ্য হয় এ কান্নাকাটি ? দরজার ছিটকিনি খুলে লণ্ঠনটা নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ি। ঘরের ভেতর একরাশ ভাঙ্গা ফার্নিচার। স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ফার্নিচারের ওপর ধূলোর আবরণ। দু'চারটে আরশোলা উড়ছে এদিকে ওদিকে। ঐ ঘরের দরজা খুললে বারান্দা। বারান্দায় এসে দাঁড়াই। পায়রাগুলো ডাকে বাক্‌-বাকুম্‌-কুম্‌। জলের ছাঁট এসে গায়ে লাগে। বারান্দার পর উঠোন। মস্ত বড়ো উঠোনের ওধারে চৌকিদারের ঘর। উঠোনভর্তি জঞ্জাল আর আগাছা। বড়ো বড়ো ঘাস হাওয়ায় ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে। একরাশ ফণি মনসার ঝোপ। হ্যারিকেনের আলোতে কিছুই নজরে আসে না। চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। সিয়াং-এর বুকের ওপর দিয়ে হিংস্র হাওয়া গর্জন করে ছুটে আসছে। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে এসে ধাক্কা দিচ্ছে ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোর গায়ে। হ্যারিকেনটা উঁচু করে তুলে

ধরি। বারান্দার কোণে একটা লোক শুয়ে আছে। সারা অঙ্গ চাদরে ঢাকা। লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অসমীয়া ভাষায় চেঁচিয়ে বলি—"এই তুমি কাঁদছো কেন?" কোন উত্তর নেই।—"এই তুমি কাঁদছো কেন?" লোকটা চাদর ফেলে দিয়ে উঠে বসে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকায় আমার দিকে। ছোটো ছোটো চোখ। মঙ্গোলিয়ান ফিচার্স। থ্যাবড়া নাক। কানের লতিতে দুটো বিরাট ফুটো। তাতে জন্তুর হাড় গোঁজা রয়েছে। মুখে দাড়িগোঁফের অভাব। বড্ডো শীর্ণ চেহারা। জিজ্ঞাসা করি—"তোমার নাম কি?"

—"ওমি ময়াং।"

—"তুমি ওরকম ভাবে কাঁদছো কেন?" আমি প্রশ্ন করি।

কোনো উত্তর নেই। আবার জিজ্ঞাসা করি—"তুমি ওরকম ভাবে কাঁদছো কেন?"

—"তুমি আমার নেনী ময়াংকে দেখেছো? নেনী ময়াং আমার বউ। আমার বউকে তুমি দেখেছো?"

—"তোমার বউকে!"

—"হ্যাঁ। আমার বউকে। নেনীর যে এ সময়ে এখানে আসবার কথা ছিলো। সে এলো না কেন? সিয়াং-এর তীরে তাকে তুমি দেখোনি?"

চক্রবর্তীর কথাগুলো মনে হয়। চক্রবর্তী আগেই এসবের আভাস দিয়েছিলো। বিশ্বনাথ নন্দীর গল্পটাও ভুলতে পারিনি।

—"তোমার বউ-এর কি হয়েছে?" প্রশ্ন করি।

—"সিয়াং ওকে খেয়েছে। সিয়াংকে কত অনুরোধ করেছি আমার বউকে ফিরিয়ে দিতে। সে ফিরিয়ে দেয়নি। সিয়াং আমার নেনীকে খেয়েছে। তাকে কতো পূজো দিয়েছি। মিথোন মেরে মিথোনের রক্ত ঢেলেছি ওর জলে। তাও নেনীকে ফেরত দিলো না।"

—"তুমি নেনীকে দেখেছো?" প্রশ্ন করি।

—"দেখিনি আবার! সিয়াং ওকে গিলে খাবার পর অনেকবার

দেখেছি। নেনীকে ধরতে গেলে নেনী পালিয়ে যায়। মুখ ঢেকে ও পালিয়ে বেড়ায়।"

—"মুখ ঢেকে কেন!" প্রশ্ন করি ওমি ময়াংকে।

—"ও মুখ দেখাবে কি করে?" বলে ওমি।

—"কেন?"

—"উই যে উই।" ঘন অন্ধকারের দিকে সে অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

—"ওখানে! ওখানে কি?"

—"ওখানে একটা বাংলো ছিলো। আর বাংলোর ঘরে আমাকে না জানিয়ে গাঁয়ের কাউকে কিছু না বলে সার্কেল অফিসারের সঙ্গে সারা রাত ধরে নেনী ঢলাঢলি করতো। রিহা গ্রামে বাপের বাড়ি যাবার নাম করে নেনী একরাত্রে এখানে চলে এসেছিলো। সার্কেল অফিসার ওকে শাড়ি গয়নার লোভ দেখিয়েছিলো আর সে লোভেই বাংলোতে রাতের বেলা এসে হাজির হয়েছিলো। পাশিঘাটে সার্কাসের দল এসে-ছিলো। আমি সার্কাসের তাঁবুতে সে রাত্তিরে খেলা দেখছিলাম।"

—"তারপর?"

—"সিয়াং সব দেখতো। সিয়াং সব দেখতে পায়। সিয়াং আমাদের দেবতা। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সে কেন এসব সহ্য করবে? সে-রাতে নেনী আর সার্কেল অফিসার যখন স্ফুর্তি করছে, তখন সিয়াং-এর জল এসে গোটা বাংলো ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। ভেসে গেলো সার্কেল অফিসার আর নেনী। আমার নেনী।" কান্নায় ওমি ময়াং ভেঙ্গে পড়ে।—"নেনীকে শাস্তি দিতে গিয়ে সিয়াং আমার বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে দিয়ে গেলো।" তারপর একটু থেমে বলে—"তুমি নেনীকে দেখেছো? নেনী বড্ডো সুন্দরী ছিলো। গাঁয়ের যুবকরা ওকে দেখে পাগল হতো। ওর জন্যে ছ'দলে কতোবার লড়াই বেধেছে। রক্তে মাটি ভিজে লাল হয়েছে।" মাথা নেড়ে জানাই নেনীকে দেখিনি। ওমি হঠাৎ খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে।—"আমার সঙ্গে চলো। নেনীকে দেখাবো, চলো আমার সঙ্গে।"

ভালো পাগলের পাল্লায় পড়লাম! এ কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে কে জানে? হাতটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিই। কোথায় যাবো ওর সঙ্গে? সিয়াং-এর ধারে? সর্বনাশ, তাহলেই হয়েছে! সিয়াং ফুঁসছে। গর্জাচ্ছে। কাছে-পিঠে ঘন ঘন বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। নিজেকে ওর হাত থেকে মুক্ত করে নিজের ঘরের দিকে-চলে যাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি এ ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোতে আর এক সন্ধ্যেও কাটাবো না। এখানকার মানুষগুলো কেমন যেন। অন্ধকার আর নির্জনতার সুযোগ নিয়ে এরা এমন সব বিশ্রী-বিশ্রী গল্প বলে। ডাক্তার বিশ্বনাথ নন্দী নেনীকেই দেখেছিলো। বিশ্বনাথ নন্দী পরে গিয়ে রোগিনীর সন্ধান পায়নি। সন্ধান পেয়েছিলো তাঁর প্রেসক্রিপশনটির। আশেপাশে ঘরবাড়ির চিহ্নমাত্র ছিলো না। একটা গাছের তলায় তার লেখা প্রেসক্রিপশনটি পড়েছিলো। না, এখানে সব সম্ভব।

॥ ছয় ॥

গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রের অফিসে যাবার রাস্তায় পোস্ট মাস্টারের ঘর। পাশিঘাটের এলাকার খানিকটা বাইরে। দুপাশে ঘন জঙ্গল। বিরাট বিরাট সব গাছ। বট আর অশ্বত্থ, আম, জাম, কাঁঠাল আর হরিতকী গাছ। জানা, অজানা কতো রকমের লতা আর গুল্ম। অপরাজিতা আর ঝুমকোলতা। দূরে শীর্ণকরণ। শীর্ণ চেহারাই বটে। ঠাণ্ডা মেজাজের। অসংখ্য নুড়ি আর পাথরে বোঝাই। বেশীর ভাগ সময় জল থাকে হাঁটুর নীচে। তবে ক্ষেপে উঠলে ওর আর শীর্ণ চেহারা থাকে না, জল গলা অবধি উঠে আসে। নদী পার হওয়া তখন অসম্ভব হয়ে ওঠে। শীর্ণকরণের ধারে ঝোপঝাড়ের ভেতর বাঁশের ঘরগুলো। পদম, মিনিয়ং আর গালংদের বাস। এরই ভেতর একটা বাসাবাড়িতে থাকে পাশিঘাটের পোস্ট মাস্টার আর তার স্ত্রী। বউটির আর কতো বয়স হবে! আঠারো কি উনিশ। টানা-টানা চোখ, ভ্রূ। কাজল-কালো আঁখি।

এক জোড়া ভ্রূ। মনে হয় তুলি দিয়ে কেউ এঁকেছে। বউটির গায়ের রং ময়লা। কিন্তু রং ময়লা হলে কি হবে? কি অসামান্য লাবণ্য মুখে চোখে। বউটি চুল টান্ করে বেঁধেছে। পেছনে দুলছে লম্বা আর ইয়া মোটা একটা বেণী। কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ফোঁটা। ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে বউটি তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে দুর্ভেদ্য অরণ্যের দিকে। বট আর অশ্বত্থের দিকে। তলায় তলায় যার জমাট অন্ধকার। কাঁঠাল গাছটার গা বেয়ে উঠেছে অসংখ্য লতা। একরাশ ফুল নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে দুলছে। কিছুদূরে বৃষ্টির জল জমে একটা ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। তাতে ফুটে রয়েছে দুটো শাপলা ফুল। কুঁড়ি সহ শাপলার ডাঁটাগুলো নড়ছে। কাঠবিড়ালীটা জাম-গাছের গা বেয়ে সুরুত সুরুত করে উঠছে আর নামছে। নজর করে বউটিকে দেখছে। প্রতিদিনই দেখে, দুজনের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দূরে পাহাড়গুলোর বুকের ওপর দিয়ে হালকা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। পাহাড়গুলোতে রয়েছে সবুজ আর নীলের মিশ্রণ। এ অঞ্চলটাতে সারাদিন একটা লোক চোখে পড়ে না। সারাটা দুপুর কি রকম ভীষণ নিঃঝুম, নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে "চোখ গেলো" "চোখ গেলো" বলে পাখীটার আর্তনাদ। বউটি তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকের সব কিছু দেখে। সে বড্ডো একা। সঙ্গী নেই। সাথী নেই। লোক নেই। জন নেই। বাসাবাড়ীর বাঁশের বারান্দায় বউটি দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে মুখখানা ম্লান করে। আমি ওই পথে স্কুলে যাই। ভোরে ক্লাস বসে, দুপুরের দিকে আমি বাড়ি ফিরি। শীর্ণকরণ হেঁটে পার হই। কোনো-দিন জল কমবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। বউটিকে আমি দেখি। বউটি আমাকে দেখে। এই গভীর, নির্জন প্রান্তরে যেখানে মিনিয়ং আর পদমরা থাকে, যাদের ভাষা একবর্ণ বোঝা যায় না, যেখানে জঙ্গল আর জঙ্গল, সেখানে দুজনে দুজনার বড়ো আপনার লোক বলে মনে হয়। আমি জানি বউটি কি ভাবে। পোস্ট মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে আমি স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছি। বউটি আমার

কাছে দুঃখ করে বলেছে—"প্রায় সারাটা দিন উনি পোস্ট অফিসে কাজকর্ম নিয়ে সময় কাটান। বলুন আমার সময় কি কাটে ?"

এ আক্ষেপের উত্তরে কি বলবো ভেবে পাইনে। পোস্ট মাস্টার চেয়ারে পা তুলে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ করে যায়। হাতের আঙুলে ধরা থাকে একটা বিড়ি। কাজ আর কাজ। সম্বল একটা মিরি পিয়ন। মনে মনে ভাবি তোমার তো বাপু রয়েছে রেজিস্টারড লেটার, খাম, পোস্টকার্ড, মণিঅর্ডার, স্ট্যাম্প আর সেভিংস এ্যাকাউণ্ট। বউকে কি দিলে! একটা কচি কোমল তুলতুলে শিশুর-চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দুবছরের ওপরে হয়ে গেলো। পোস্ট মাস্টার যেন কেমন। খালি কাজ আর কাজ।

—"ভাবুন তো কলকাতার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে এখানে নিয়ে এলে কেমন লাগে ?" বউটির মুখখানা বড্ডো করুণ আর বিষাদ মাখানো। কি জবাব দেবো ? আমি দেখেছি দুপুরবেলা ওর সঙ্গী হয় টিয়া, বুলবুলি, শালিক আর কাঠবিড়ালী।

পোস্ট মাস্টার বলে—"সারাটা দিন পোস্ট অফিসে না কাটিয়ে উপায় আছে ? যে রকম কাজের ভিড়। কাজের গাফিলতি হলে কেউ আমাকে ছাড়বে ? ডিব্রুগড়ের অফিস থেকে ইন্‌স্‌পেক্‌শনে এসে চাকরি খেয়ে দেবে। আর চাকরি গেলে খাবো কি বলুন। অনেক আগেই যে ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছি।" পূব পাকিস্থানের ছোট্ট একটি গ্রাম বোধ করি ওর স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে।—"তাই সময় সমান ভাগ করে নিয়েছি। পোস্ট অফিস পায় বারো ঘণ্টা, বউ-এর জন্যে বারো ঘণ্টা।" পানে লাল হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বের করে পোস্ট মাস্টার হাসে। কানের বিড়িটা আঙুলে নিয়ে টেবিলের ওপর ঠোকে।

—"তোমার কাজই সব ? বউ কিছু নয় ?" বলে বউটি।

—"আরে লোক না দিলে আমি কি করবো! ডিব্রুগড়, জোড়হাট আর শিলং অফিসে কি কম লেখালেখি করেছি।"

—"তুমি কিচ্ছু লেখোনি।" বউটি বলে।

সর্বনাশ, বউটি সব ফাঁস করে দিচ্ছে। পোস্ট মাস্টারের কলম ভোঁতা করে দিচ্ছে। বউটির দাঁতগুলো কি অসম্ভব ধবধবে সাদা!

বউটি এক ফাঁকে ঘি-এ ভাজা মুড়ি আর চা নিয়ে আসে।—"বলুন তো সারাদিন আমার কি করে কাটে?" বেশ বুঝতে পারি একটা দুরন্ত যৌবন ওর ভেতর মাথা গুমরে মরছে। আমি কি করতে পারি? কি সান্ত্বনা ওকে আমি দিতে পারি?

—"তাও তো সিয়াং-এর টুটিং আর টিরাপের খোন্‌সাতে বদলি হতে হয়নি। পাশিঘাট ওদের তুলনায় স্বর্গ।" বলে পোস্ট মাস্টার।

—"ছাই ভালো!" বলে বউটি।

—"থারটি থ্রি এ্যাণ্ড্ ওয়ান থার্ড এলাউয়েন্স, ফ্রি কোয়ার্টার্স। আরো অনেক সুবিধে। একরাশ টাকা।" বলে পোস্ট মাস্টার।

—"তুমি তোমার টাকা আর সুখ-সুবিধে নিয়ে থাকো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে—"ওর ফিরতে ফিরতে রাত সাতটা সাড়ে সাতটা হয়। আশেপাশে ঘন জঙ্গল, অন্ধকারে কিছুই নজরে আসে না। বাঁশের দরজাটা ভালো করে বন্ধ হয় না। এমন ভয় করে আমার।" বউটি কেমন উদাস দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাঁশের ঘরটা ঠিক সন্ধ্যের পর। গভীর অন্ধকারে বাঁশের দরজাটা বন্ধ করে হ্যারিকেনটা নিয়ে বউটি বসে আছে। দমকা বাতাস এসে আলো নিভিয়ে দিতে চায়। বাঁশের দরজার ফাঁক দিয়ে বাতাসের ভেতরে ঢোকবার প্রয়াস। কাছাকাছি একটা পেঁচা কি বিশ্রীভাবে ডাকছে। বউটির মুখটা ভয়ে কেমন সাদা হয়ে গেছে। তার রূপ-যৌবন মাস্টার মশাই-এর শীলমোহর, পার্শেল আর মণিঅর্ডারের নীচে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মরছে। মাস্টার মশাই মাথা নীচু করে টাকার হিসেব করছে। স্টাম্প আর পোস্টকার্ড গুনছে। ওয়ার্ড্‌স্ আর ফিগারস্-এর মাঝে পোস্ট মাস্টার ডুবে রয়েছে।

বউটি কাঁহাতক তাকিয়ে থাকতে পারে শাপলা আর শালুকের দিকে ? বেতঝাপ আর কচুবনেব দিকে ? কাঁঠাল গাছটার দিকে ? যেখানে প্রকাণ্ড সাপটা গাছের ডাল পেঁচিয়ে রয়েছে। যার নীচে গরুর মাথার ওপর দাঁড়িয়ে শালিকটা ঘন ঘন ওর কান ঠুকরে দিচ্ছে। যেখানে আদি ছেলেগুলো গিরগিটি জাতীয় প্রাণীটার পেছনে দৌড়ুচ্ছে। গিরগিটিটাকে কিছুতেই ওরা ধরতে পারছে না। ওটা দৌড়ুচ্ছে এগাছ থেকে ওগাছে। ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মের মাঝে দিয়ে। আদি ছেলেগুলো কিন্তু ওকে ধরবেই।

ধরে ওকে আগুনে ঝলসিয়ে খাবে। বাত আর কোমরের দরদের জন্যে ওর মাংস নাকি অব্যর্থ। বিষব্যথা সারবেই। এই মুহূর্তে গিরগিটিটা একটা প্রকাণ্ড গাছের ডালে গিয়ে উঠেছে। একেবারে ছেলেদের নাগালের বাইরে। ছেলেরা ছাড়বে না। গাছের গায়ের গর্তটাতে ওরা খরকুটো দিয়ে আগুন দিয়েছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া! কি ধোঁয়া! কি ধোঁয়া! নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটু পরেই আগুনের লকলকে জিহ্বা এদিক ওদিক থেকে উঁকি দেয়। গাছটা জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাবে যাক্। ক্ষতি নেই। অরণ্যে গাছ-লতার অভাব নেই। গাছ তেতে উঠলে গিরগিটিটা গাছ থেকে নেমে পড়বে। কয়েকটা ছেলে বেতের খাপ থেকে ঝকঝকে দা বের করে পাথরের গায়ে শান দিচ্ছে। গিরগিটিটাকে আগুনে ঝলসিয়ে ওরা টুকরো টুকরো করবে। ওর মাংস খেলে বৃদ্ধ, যুবক, তরুণের শরীরের যে কোনো স্থানের ব্যথা সারবে। গাছের গর্ত থেকে আগুনের লকলকে জিহ্বা উঁকি দিচ্ছে। গাছের ডালে গিরগিটিটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আনন্দে হাততালি দিচ্ছে আদি ছেলেগুলো। পোস্ট মাস্টারের ঘরে বসে আমি ঘি-এ ভাজা মুড়ি খাচ্ছি আর চা-এর কাপে চুমুক দিচ্ছি। পোস্ট মাস্টার মাথায় তেল চাপড়াচ্ছে।

ওর খালি গা। পরনে একটা লুঙ্গি। পোস্ট মাস্টার মশাই-এর কি সরু দেহটা। বুক, পেট এই এতোটুকুন। হাত-পাগুলো পাঁকাটির

মতো। মানুষটা ক্ষীণকায় আর বড্ডো দুর্বল। কিন্তু বউ-এর স্বাস্থ্য অসম্ভব ভালো। দেহ থেকে স্বাস্থ্য যেন উপছিয়ে পড়ছে। দুরন্ত যৌবন যেন বাগ মানতে চায় না। পোস্ট মাস্টার কি শীলমোহর, স্ট্যাম্প, বেয়ারিং চিঠি আর রেজিস্টারড্ লেটারের স্তূপের নীচে রেখে এ দুরন্ত যৌবনকে দমবন্ধ করে মারতে পারবে? মাস্টার মশাই-এর বয়সটা যেন মেয়েটির তুলনায় অনেক বেশী। পঁয়ত্রিশ তো বটেই, ওপরেও হতে পারে। আর বউটির উনিশ কি বিশ।

—"আপনি গল্প করুন। আমি ততোক্ষণ শীর্ণকরণের জলে চানটা সেরে আসি। সিয়াং-এ নাইতে গেলে ভালো হতো। তবে সিয়াং এখান থেকে অনেকটা দূর। আর ওখানে জলে যেরকম কারেণ্ট, বড্ডো ভয় করে।" মাথায় তেল চাপড়াতে চাপড়াতে মাস্টার মশাই চলে যায়। কাঁধে তার গামছা, পরনে লুঙ্গি।

—"শ্যামবাজারে আমার বাবার বাড়ি। পদ্মপুকুরে আমার বোনের বিয়ে হয়েছে। মামা থাকে কালীঘাটে।"

—"শ্যামবাজারের কোনখানে আপনার বাড়ি?"

—"ঐ যে পাঁচরাস্তা এসে যেখানে মিলেছে ঠিক সেই মোড়ের মাথায়। পুলিসটা যেখানে হাত-পা নেড়ে মোটর আর বাস থামায়। আবার যেতে দেয়। সেখান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে আমাদের বাড়ি। জানালা থেকে হরদমই দেখতাম সে দৃশ্য। লোকের কি ভিড়। কি ভালোই না লাগতো।" বউটি নেফার এ অরণ্যে বসে স্বপ্ন দেখছে শ্যামবাজারের রাস্তার। কলকাতার জন-অরণ্যের।

—"আমার পিসির বাড়ি তাহলে আপনাদের বাড়ির খুব কাছে? খুব যেতাম পিসির বাড়ি।" বলি আমি। আত্মীয়তা নিবিড় করতে চাই। নিবিড় করতে চাই ওদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা।

—"আশ্চর্য! কোন দিন দেখিনি তো আপনাকে।"

—"অতো ভিড়ের ভেতর লোক চিনে রাখা মুশকিল। দেখলেও মনে রাখার কোনো কারণ নেই।" বলি আমি।

—পাঁচরাস্তার মোড়ের সেই পুলিসটাকে আপনার মনে আছে? ইয়া বিরাট দৈত্যের মতো চেহারা। ইয়া গোঁফ। ইয়া দাড়ি। কি চওড়া বুকটা। কোথাও কাউকে গ্রেপ্তার করলে ঠিক ইঁদুরের ছানার মতো ঝুলিয়ে নিয়ে যেতো।”

পুলিসটার চেহারাটা ঠিক মনে করতে পারিনে। গোঁফ সহ ঐ রকম পুলিস কলকাতায় অনেক রয়েছে। এতো লোক থাকতে পুলিসটাকেই বা মনে রাখতে যাবো কেন?

শীর্ণকরণের জলে মাস্টার মশাই স্নান করতে গেছে। মাস্টার মশাই বড্ডো শীর্ণ। সিয়াংকে মাস্টার মশাই-এর বড্ডো ভয়।

—“কিন্তু জানেন, ঐ বিরাট পুলিসটাকে দেখেছি ওর বউ-এর সঙ্গে যেতে। যখন ডিউটি থাকতো না তখন ছোট ছেলেমেয়ের হাত ধরে বউকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। ছোট্ট অতোটুকুন স্ত্রীর কাছে অতো বড়ো লোকটাকে এমন বেখাপ্পা দেখাতো। এমন হাসি পেতো আমার। অতো বড়ো লোকটা, যার ডিউটির সময় অতো প্রতাপ – সেই লোকটা অতোটুকুন বউ-এর কাছে ঠিক কেঁচো বনে যেতো। সুবোধ আর শান্তশিষ্ট ছেলের মতো সঙ্গে সঙ্গে চলতো। এমন হাসি পেতো আমার।”

বউটি হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমার মোটেই হাসি পায় না। এতে হাসবার কি আছে আমি ভেবে পাইনে। পুলিস-কাহিনী ছাড়া বউটি কি অন্য কাহিনী জানে না? না শ্যামবাজারের রাস্তায় সে আর কিছু দেখেনি? নেফার অরণ্যে এসে বউটি পুলিস দম্পতিকে ভুলতে পারেনি।

মাস্টার মশাই আমি যতোদূর জানি বউকে নিয়ে বিশেষ কোথাও বেরোন না।

—“শ্যামবাজারের নিধুবাবুর দোকানের ফুলকপির সিঙ্গাড়া খেয়েছেন?” বউটি প্রশ্ন করে।

—“না খাইনি। পিসীমা ঘরের খাবার দিয়েছেন। নিধুবাবুর দোকানের সিঙ্গাড়া দেননি।”

—"খেলে বুঝতেন। এখনো মুখে লেগে আছে।" বউটি বলে।

নিধুবাবুর সিঙ্গাড়ার প্রশংসা নেফার পাশিঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সঙ্গীবিহীন বউটির হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছে। ধন্য শ্যামবাজারের গোঁফওয়ালা পুলিস! ধন্য নিধুবাবু আর তার সিঙ্গাড়া!

বউটি এক অপরাহ্ণে স্বামীর পেছনে পেছনে এসে হাওড়ায় নর্থ বিহার এক্সপ্রেসে থার্ড ক্লাসে চড়ে বসেছে। জানে না কোথায় নেফা, কোথায় সিয়াং ডিভিসান। কোথায় আলং আর পাশিঘাট। নেফা সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। কেউ বলেছে নাগাদের অঞ্চলে যাচ্ছিস। কেউ বলেছে গারো আর লুসাইদের কাছে। বউটি হয়তো ক্লাস সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়েছে। ভূগোলের জ্ঞান তার অতি সামান্য। বারুণীতে ট্রেন বদলাতে হবে। কয়েক ঘণ্টা আসাম মেইলের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। সে প্ল্যাটফরমে স্বামীর গা ঘেঁষে বসে রয়েছে। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। কোথায় এক অজানা নাম-না-জানা দেশে সে চলেছে। কাউকে সে চেনে না। সব নূতন মুখ। এর আগে কোনদিন কলকাতার বাইরে সে আসেনি। শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, গৌহাটি, ডিফু, লামডিং, ডিব্রুগড়, আরো কতো নাম-না-জানা স্টেশন। কতো জায়গা। কতো অপরিচিত মুখ। কতোরকম অপরিচিত ভাষায় তারা কথা বলে। দু-একজনের কথা ছাড়া বেশীর ভাগ লোকের কথাবার্তা ভালো করে সে বুঝতে পারে না। মা গো, এ দেশটাতে এতো লোক আছে? এর আগে তার জানা ছিলো না। সে শুধু স্বামীর গা ঘেঁষে বসে থাকে। বসে থাকে জড়োসড়ো ভাবে। ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। কতো আর জিজ্ঞাসা করবে? ভরসা শুধু দুর্বল, ক্ষীণ ওই একরত্তি মানুষটা। যার বুকের হাড়গুলো গোনা যায়। যে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ঘন ঘন কাশে। ডিব্রুগড় থেকে মোহনবাড়ি। মোহনবাড়িতে যখন সে একটা ভাঙ্গা প্লেনে চড়লো তখন তার কান্না পেয়ে গেছে। মানুষের আর কতো সহ্য হয়? তারপর প্লেনটা

যখন হুস করে একসময়ে আকাশে উঠে গেছে তখন বউটি তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছে। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেছে। নীচে ভীষণ সব পাহাড় আর পর্বত। আর কি অরণ্য! বউটির গা-টা কেমন গুলোয়। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে সে। ভরসা ওই ক্ষীণকায় মানুষটা।

পঁচিশ মিনিট তাকে এভাবে থাকতে হবে। তারপর প্লেনটা তাদের পাশিঘাটে নামিয়ে দেবে। বউটির সাহসের সীমা পেরিয়ে গেছে। ধৈর্যের শেষপ্রান্তে সে এসেছে। ক্ষীণকণ্ঠে সে স্বামীকে বলেছে—"আমাকে বাবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার বড্ডো ভয় করছে।"

পোস্ট মাস্টার শীর্ণ, শিরাবহুল আঙুলগুলো বউ-এর সারা গায়ে বুলোতে বুলোতে বলেছে—"ভয় কি, আমি রয়েছি।"

" সব যুগের সব পুরুষের দল তাদের স্ত্রীদের কাছে এ কথা বলেছে। তাদের মতো বীর সাহসী দুনিয়ায় আর কে আছে।"

জানিনে বউটি কতোটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। প্লেন উড়ে চলে পাশিঘাটের দিকে ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করে। পাশিঘাটে পৌঁছে এবং তারপর নেফাতে দু'বছর কাটিয়ে বউটি পোক্ত হয়েছে। মনে তার অনেক সাহস হয়েছে। তবুও অনেক কিছু সে বুঝতে পারে না। নেফার কোথায় বা কামেঙ্, কোথায় বা টিরাপ। চীন আর তিব্বত দেশগুলোই বা কোথায় তা সে ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না। কতো বর্ষণমুখর রাত্তিরে স্বামীর শীর্ণ অপ্রশস্ত বুকে মাথা গুঁজে সে পড়ে থাকে। একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলে। বাইরে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ব্যাঙ ডেকে চলে। কটর কটর। চিরিক্, চিরিক্। কতো রকমের ডাক আর শব্দ।

ভয়ে বউটির মুখে কথা সরে না। যাক সে-সব। এই মুহূর্তে নিস্তব্ধ দুপুরে স্কুল থেকে ঘরে ফিরছিলাম। বউটি বাঁশের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। হাত তুলে আমাকে ডাকে। ওদের বাড়িতে

যাবার জন্যে আমাকে বউটি আহ্বান করে। একে ভরদুপুর, তাতে ভরা যৌবন। সাড়াশব্দহীন পথঘাট। পোস্ট মাস্টার মশাই ব্যস্ত চিঠিপত্তর নিয়ে। এটা কি গল্প করার সময়? মাস্টার মশাই ফিরে এলে সন্ধ্যের সময় বরং গল্প করা যাবে। চেঁচিয়ে বলি—"এখন একটু ব্যস্ত আছি। অন্য সময় আসা যাবে।" আমার বোধ হয় সাহস একটু কম। বউটির এ সময়ে সঙ্গী আমি নাই বা হলাম। নেফাকে আমার বড্ডো ভয়।

*　　　*　　　*

দুপুরবেলা স্কুল থেকে ফিরছিলাম। বউটি বাঁশের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিলো। ওর মুখে ম্লান হাসি। হাত তুলে আমাকে ডাকলে। একবার নয়, বারকয়েক। সে আহ্বান উপেক্ষা করবার শক্তি আমার ছিলো না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। গেলাম অনেক সাহস সঞ্চয় করে। আমার পুরুষত্বকে অবমাননা করতে আমি রাজী নই। বউটি আমাকে অনেক আদরযত্ন করলে। খেতে দিয়েছিলো মুড়ি, নারকেলের নাড়ু। ঘরের তৈরী সন্দেশ। হাত ধোবার জন্যে সাবান দিয়েছিলো। হাতে জল ঢালার সময় হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছিলো। আমার সারা দেহ কেঁপে উঠেছিলো। নেফার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যকে আমার বড্ডো ভয়। তার চেয়ে বেশী ভয় পাই আমি দুরন্ত চঞ্চলভরা যৌবনকে। আর যদি হয় সে যৌবন নিঃসঙ্গ আর একাকী। সে যৌবনের প্লাবন কূলকিনারা ছাপিয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছে। শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হচ্ছে। বউটি উঠে একসময়ে ভেতরের দিকের ঘরে চলে যায়। আমি আশঙ্কার দোলায় দুলতে থাকি। কতোক্ষণ পরে ও ফিরে আসে। হাতে একটি কাপড়ের পুঁটলি। বউটি পুঁটলিটা আমার সামনে খুলে ফেলে। আমি কেমন হকচকিয়ে যাই। ভেতরে একরাশ গয়না। ঝুমকো, নাকছাবি, নোলক, মটরমালা, সিঁথি, মল, ঘুঙুর, চুড়ি, বালা, কঙ্কণ। সর্বনাশ! সব নিয়ে পোস্ট মাস্টারকে সর্বস্বান্ত করে ও আমার সঙ্গে

পালাবে নাকি ? মনে মনে ভাবি এর পরই বোধ হয় বউটি সেই বিশ্রী প্রস্তাব আনবে। সর্বনেশে প্রস্তাব। ওকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবো আমি ? এর জন্যেই ও সারা দুপুর জানালার কাছে আমার অপেক্ষায় ছিলো। ও শুধু যৌবনে বিশ্বাসী নয়। হয়তো অলঙ্কার আর অর্থের ওপর বউটির অগাধ বিশ্বাস। ও বললে যে ওর এক দূর সম্পর্কের বুড়ী পিসিমা মৃত্যুর আগে ওর সেবাযত্নে খুশী হয়ে চুপি চুপি এগুলো ওর হাতে তুলে দিয়েছিলো। কেউ জানে না এ খবর। পোস্ট মাস্টারও খবর পায়নি।

—"তা এগুলো এসময়ে বের করার উদ্দেশ্য ?"

আমার রূঢ় কণ্ঠস্বরে আমি নিজেই কেমন চমকিয়ে উঠি। উত্তর না পেয়ে ওর দিকে তাকাই। বউটি কাঁদছে। ওর অশ্রুজলে কেমন দুর্বল বোধ করি, এসময় ও কাঁদছে কেন ? এসময় কি কেউ কাঁদে ? থতমত খেয়ে যাই। যা বলবার বলে ফেলুক না। পালাবার আগে কাঁদা। এ নিশ্চয় কুম্ভীরাশ্রু। অস্বস্তি বাড়িয়ে লাভ আছে কিছু ? ও কথা বলে না। ক্রমাগত প্রশ্নের পর বউটি যা উত্তর দেয় তার সারাংশ হচ্ছে যে ওর স্বামী নেশা করে। মদ, গাঁজা, আফিং কিছুই তার বাদ যায় না। সম্প্রতি সরকারী তহবিল তছরূপ করেছে। ধরাও পড়ে গেছে। চাকরি যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে জেল। ওকে বাঁচাতে হবে। এখনো সময় আছে। টাকাটা দিয়ে দিতে পারলে এ যাত্রা পোস্ট মাস্টার বেঁচে যায়। গয়নাগুলো নিয়ে আমাকে কলকাতা কিংবা গৌহাটি যেতে হবে। তারপর টাকা এনে পোস্ট মাস্টারকে জেল থেকে আর অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এসব আমাকেই করতে হবে। আর বউটির তাই ইচ্ছে।

গয়নার পুঁটলি বউটি আমার হাতে তুলে দেয়। পোস্ট মাস্টারের জেল হলে বউটি নাকি বাঁচবে না। সঙ্গে সঙ্গে আবার পিঠের ওপরকার শাড়ি তুলে নগ্ন পিঠটা আমাকে দেখায়। বেত্রাঘাতে কালসিটে পড়েছে। গত রাত্তিরে পোস্ট মাস্টারের অত্যাচারের ওরাই সাক্ষী।

পোস্ট মাস্টারের শীর্ণ চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাতের তেলো মাথার ওপর চাপড়াতে চাপড়াতে শীর্ণকরণের দিকে স্নানের উদ্দেশ্যে চলেছে। পোস্ট মাস্টারের খালি গা। পরণে একটি বিবর্ণ লুঙ্গি। গয়নাগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে পড়ি। মেয়েটির অনুরোধ উপেক্ষা করবার শক্তি আমার নেই। টাকা আমাকে যোগাড় করতেই হবে। পোস্ট মাস্টারকে বাঁচাতে হবে। তবে গয়নার বদলে টাকা নয়। টাকা আমাকে অন্য কোনো উপায়ে যোগাড় করতে হবে। মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিই। শপথ নিই টাকা নিয়ে ফিরবো। যাবার সময় পিছন ফিরে একবার ওকে দেখি। বড্ডো সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। বৌটি মিটিমিটি হাসছে। আমি এতো দুর্বল বোধ করছি কেন? আজ দুপুরে স্কুল থেকে ছুটি না নিলেও চলতো।

* * * *

॥ সাত ॥

পাশিঘাট হাসপাতালের গা ঘেঁষে রাস্তাটা চলে গেছে মির্মি গ্রামের দিকে। রাস্তাটা ভীষণ নির্জন, আর ভীষণ অন্ধকার। এর ওপর ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গেছে। দু'দিকে গভীর জঙ্গল, নুড়ি আর পাথর-ছড়ানো পথ। প্রতি পদে হোঁচট খেতে হয়। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সন্তর্পণে এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর একটা বিশাল লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে হতে বেঁচে গেলাম। হাতে তার না আছে একটা টর্চ, না আছে একটা লাঠি।

মিস্টার ভর্মার আয়তন নেহাৎ নগণ্য নয়। ভয়ডর বলে তার কিছু নেই। পাশের জঙ্গলে সাপ রয়েছে। জোঁক রয়েছে। চিতে আর ভালুকের অভাব নেই। সিয়াং-এ বন্যার ঢল নেমেছে। বন্যবরাহের জন্যে পথ চলা দুষ্কর।—"এই যে মিস্টার ভর্মা, ভালো আছেন?" প্রশ্ন করি।

—"ভালো আছি। আপনি ভালো?" হিন্দীতে প্রশ্ন করে ভর্মা।

ভর্মা পাশিঘাটে বেশ কিছুদিন যাবৎ রয়েছে।

—"আমাদের ক্র্যাফট সেণ্টারে একদিনও এলেন না?" অনুযোগের সুরে বলে ভর্মা।

—"যে কোনোদিন এসে যাবো।"

ভর্মার সাথে পাল্লা দিয়ে পা চালাই। সেই সঙ্গে কথাবার্তা চলে। ভর্মা ক্র্যাফট সেণ্টারের কর্তা। ইন-চার্জ।

—"স্থানীয় অধিবাসীদের সমস্ত চাহিদা এই ক্র্যাফট সেণ্টার মিটোচ্ছে। এখানে কাঠ আর বেতের আসবাব তৈরী হয়।" বলে ভর্মা।

—"আমি পাশিঘাটে এসে সব শুনেছি। আপনার চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।"

—"আমার একটা হবি রয়েছে। নেফার ট্রাইবস্‌দের সম্বন্ধে রিসার্চ করছি। ওদের সমাজ নিয়ে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। ক্র্যাফট সেণ্টার আর এই পড়াশুনো নিয়ে সময় বেশ কেটে যাচ্ছে।" ভর্মার সঙ্গে পা চালিয়ে পাল্লা দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

—"এ অন্ধকার আর জংলা পথে একটা টর্চ নিয়ে চলাফেরা করলে ভালো হতো মিস্টার ভর্মা। নানারকম জন্তু-জানোয়ার রয়েছে।"

—"অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে জন্তু-জানোয়ারের দল আপনার ক্ষতি ততোক্ষণ করবে না যতোক্ষণ না আপনি ওদের কিছু ক্ষতি করছেন। এ বিষয়ে ওরা মানুষ থেকে ওদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছে। কাজকর্মে ব্যস্ত রয়েছেন না হলে গল্পগুজবে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিতাম।"

—"আজকে রাতে ছেলে পড়ানোর ঝামেলা নেই।" আমি জবাব দিই।

—"তাহলে চলুন না আমার বাংলোতে। কতোটা আর পথ? মাইল খানেক হবে হয়তো।" ভর্মা আমার হাতে একটা মৃদু চাপ দেয়।—"চলুন ভালো কফি দেবো।" বলে ভর্মা। রাজী হতে হয়।

—"জন্তু-জানোয়ার মানুষের কিরকম উপকার করে তার একটা নমুনা দিচ্ছি। ঘটনাটা এই পাশের মির্‌মি গ্রামেই ঘটেছিলো। বাঁশের ঘরের বারান্দায় সন্তানকে শুইয়ে রেখে মা জঙ্গলে ঢুকেছিলো কাঠ কাটতে। টাপু পূজোতে গ্রামের সবাই মেতেছে। ট্রাইবস্‌দের ধারণা এ পূজো করলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এক-একটা ট্রাইবের লোক-সংখ্যা খুবই কম। যাক। মা কাঠ নিয়ে ফিরে এসে দেখে একটা প্রকাণ্ড কালকেউটে সন্তানের মাথার ওপর ফণা মেলে দুলছে।"

—"তারপর ?"

—"মার চক্ষুস্থির। সন্তান হাত-পা নেড়ে খেলা করছে আর তার মাথার ওপর দুলছে সাক্ষাৎ যম। মার চীৎকার করবার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। তাছাড়া চীৎকার করলেই বা কে শোনে। আশে-পাশে কেউ নেই। সব টাপু পূজোয় গেছে।"

—"সাংঘাতিক সিচুয়েসন !" বলি আমি।

—"সিচুয়েসন আরো জটিল আরো ভয়ঙ্কর হয় যখন পায়ে পায়ে একটা নেকড়ে এগিয়ে এসে দাওয়ায় উঠে পড়ে। শিশুটিকে মুখে তুলে নিঃশব্দে পাশের জঙ্গলে অদৃশ্য হবে বলে সে প্রস্তুত হচ্ছে।"

—"মার অবস্থাটা বেশ ভালো করেই বুঝতে পাচ্ছি।" বলি আমি।

—"নেকড়ে বাঘটা বোধ করি লাফাতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার আগেই কালকেউটে ছোবল মারার জন্যে তার দিকে এগিয়ে গেছে। বিরাট সাপ। এরপর শুরু হয় সাপ আর বাঘে যুদ্ধ। মিনিট পনেরো চলেছিলো সে যুদ্ধ। মা ইতিমধ্যে চীৎকার শুরু করে দিয়েছে। আর তার চীৎকারে গ্রামবাসীরা সব ছুটে এসেছে। কিন্তু প্রাণী দুটো ততোক্ষণে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। সাপের বিষে নেকড়ে ধুঁকছে। তার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। আর নেকড়ে তার দাঁত ও হাতপায়ের নখ দিয়ে কালকেউটেকে ভীষণ ভাবে জখম করেছে। গ্রামবাসীদের কিছু করতে হয়নি। মৃত্যু এসে দুজনকে শান্তি দিয়েছে। বলুন দেখি এর পর জন্তু-জানোয়ারের ওপর শ্রদ্ধা জাগে কিনা ?"

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এরি মধ্যে "উফ্" বলে একটা শব্দ। পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে ততোক্ষণে মিস্টার ভর্মা অন্ধকারে পথের ওপর বসে পড়েছে।

টর্চের আলো ফেলে দেখি ভর্মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। গোড়ালি থেকে রক্তের ধারা নেমেছে। একটা দাঁতালো বন্যবরাহ মাথা নীচু করে ওধারের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। যাবার আগে ভর্মার গোড়ালি দন্তবিদ্ধ করে গেছে। জানিনে ভর্মা বরাহের কোনো ক্ষতি করেছিলো কিনা।

ভর্মাকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে হতো। কিন্তু ভাগ্য ভালো। সার্কেল অফিসার জীপে ঐ পথ ধরেই যাচ্ছিলো। সার্কেল অফিসারের জীপে উঠিয়ে ভর্মাকে পাশিঘাটের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সেখানে ওষুধপত্তর দেবার পর ক্ষতের ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়।

ভর্মার বাংলোতে বসে সে রাত্রিতে নেফা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনেছি। ভর্মা ব্যাণ্ডেজবাঁধা পাখানা বিছানার একধারে আলগোছে রেখে আধশোয়া অবস্থায় নেফা-কাহিনী শুনিয়েছে।

ভর্মা বলে—"সারাটা নেফা এ দশ বছর চষে বেড়িয়েছি। ১৯৫৪ সালে ফ্রন্টিয়ার ডিভিসান পাঁচটা ডিভিসানে পরিণত হলো। নাম হলো কামেঙ, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত আর টিরাপ। টুয়েঙ্সাঙ্ সঙ্গে ছিলো। চলে গেলো নাগা হিলসের সঙ্গে। পশ্চিমদিক থেকে প্রথমে হলো কামেঙ ডিভিসান। হেড কোয়ার্টার্স বম্‌ডিলা। সুবনসিরির জিরো। সিয়াং-এর আলং। লোহিতের তেজু। আর টিরাপের চ্যাংলাং।"

ভর্মা বলে যাচ্ছিলো। আমি ওর কথা শুনছিলাম আর একটা অয়েল পেন্টিং-এর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম।—"কি দেখছেন মশাই? জানি ভালো লাগবে। আমার স্ত্রীর হাতের। আঁকতে জানে। অর্ধেকটা হয়ে যাবার পর ফেলে রেখেছিলো। আমি জোর-জবরদস্তি করাতে সমস্ত কাজটা শেষ করলে। একটা মিস্‌মী মেয়ের

তুলি আর রঙের অপূর্ব যোগাযোগ।” ভর্মা ছবির সৌন্দর্যের ভেতর ডুবে থাকে।

—“আপনার স্ত্রী কোথায়? আমি পাশিঘাটে এসেছি তিন মাস হলো কিন্তু কোনোদিন আপনার স্ত্রীকে দেখিনি।”

—“দিল্লীতে ওর মার কাছে রয়েছে। মার বয়স হয়েছে। মেয়েকে মা খুব ভালোবাসে। এমন সন্তানস্নেহ আমি সচরাচর দেখিনি। আমার স্ত্রী এখানে চলে আসার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে। সপ্তাহে ছুখানা চিঠি লিখে ওকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু আমি বাধা দিচ্ছি। শাশুড়ীর দিকটা দেখতে হবে তো। কয়েকটা দিন মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে চায় তাতে দোষটা কিসের।”

ভর্মা মদের বোতল বের করেছে। গ্লাসে মদ ঢেলে আমাকে দিয়েছিলো। আমি ও রসে বঞ্চিত শুনে নিজে একটু একটু করে গলায় ঢালছে। চাকর আমাকে কফি আর বিস্কুট দিয়ে গেছে। ভর্মা সেদিন অনেক কিছু আলোচনা করেছিলো। সব মনে নেই। যেটুকু মনে আছে তাই শোনাচ্ছি।

—“অস্ট্রো এসিয়াটিক গ্রুপের লোকেরা, মানে আসামের খাসী, জয়ন্তিয়া, বিহারের ছোটনাগপুরের ওঁরাও, মুণ্ডারা এবং নেফার কোনো কোনো পার্বত্য অধিবাসীরা নাকি একই দলভুক্ত লোক। আবার দেখুন এই গ্রুপের লোকদের সঙ্গে কম্বোডিয়ার লোকদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।” ভর্মা সার্থক নৃতত্ত্ববিদ্। জাতির ইতিহাস, উৎপত্তি, মিশ্রণ, বিলোপ প্রভৃতি ঘেঁটে বেড়ানোই তার কাজ।

—“আপনাকে নিশ্চয়ই অনেক পড়াশুনো করতে হয়? অনেক পরিশ্রম করতে হয়?” আমি জিজ্ঞেস করি।

—“তা না করে উপায় আছে? নেফাকে লোকেরা চিনেছে তো মাত্র সেদিন। ভারত স্বাধীনতা পাবার পূর্বে নেফা ছিলো সম্পূর্ণ আননোন্। তাকে সম্পূর্ণভাবে জানতে গেলে প্রচুর পড়াশুনো এবং পরিশ্রম করতে হবে বৈকি। কতো বিভিন্ন ধরনের জাত রয়েছে

নেফাতে আর কতো বিভিন্ন ধরনের জীবনধারা তাদের। এখানে রয়েছে মনপাস্, সেরতুক্‌পেনস্, পাঙ্গিনস্, আদিস্, মিজুস্, আকাস্ ডাফলাস্, আপাটানিস্, পদমস্, মিনিয়ঙস্, গালঙস্, বরিস্, টাগিনস্, সিঙফুস্, কাচিনস্, ট্যাংসাস্, ওয়াচুস্, নঙটেস্, খামটিস্, মেজুস্। আর কতো সব ট্রাইবস্ রয়েছে।"

—"সবসুদ্ধ কতো ট্রাইবস্ হবে ?" প্রশ্ন করি।

—"আড়াইশো তো বটেই। আমার ইচ্ছে প্রত্যেকটি ট্রাইব নিয়ে আলাদা ভাবে রিসার্চ করি। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে থীসিস সাবমিট করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।"

—"এ আলোয়ান প্লেনসের তৈরী বলে মনে হচ্ছে, তাই না ?"

—"এটা মিস্‌মীদের তৈরী, আর এটা মিস্‌মী কোট।" আঙুল ঘুরিয়ে ভর্মা সব দেখাতে থাকে।

—"ওই দেয়ালে যেটা ঝুলছে সেটা আদি কোট। আর ওই আলমারির গায়ে ঝোলানো রয়েছে খামটি আর ট্যাংসাদের লুঙ্গি।" দেখতে ঠিক বর্মী লুঙ্গির মতো। আর এদিকে দেখুন দেয়ালে নানারকম বেতের টুপী ঝোলানো রয়েছে। আদিদের তৈরী বেতের টুপী ছাড়া টিরাপের ট্রাইবস্‌দের বানানো টুপীও এখানে রয়েছে। হানাহানি এবং মারপিটের পর মনুষ্যমস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্শার মাথায় বিদ্ধ করে নাচ-গান সহযোগে যে উৎসব পালন করা হতো সে উৎসবে মাথায় দেওয়া টুপীও এর ভেতর রয়েছে।"

একটা টেবিলক্লথের ডিজাইনে লোকাল কালার যথেষ্ট রয়েছে। সুন্দর হাতের কাজ। ভেবেছিলাম কোনো ট্রাইবের লোকের হাতের কাজ। ভর্মা জানায় ওটা তার স্ত্রীর হাতে তৈরী। ওরকম আরো অনেক রয়েছে। ভর্মা খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা আলমারির কাছে এগিয়ে যায়। আলমারি খুলে ভেতর থেকে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের এবং অনেক রকম কালার কম্বিনেশানের প্রচুর সূতীবস্ত্র বের করে আনে। প্রত্যেকটি বস্ত্রখণ্ডে সূচ আর সূতোর সাহায্যে ট্রাইবস্‌দের

জীবনযাত্রা ও সমাজজীবন থেকে খানিকটা খানিকটা তুলে ধরা হয়েছে।

—"চমৎকার! তুলনা হয় না!" মুখে বলি আর প্রশংসাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি ওগুলোর দিকে।

—"আমার স্ত্রীর হাতের।" বলে ভর্মা।

—"স্ত্রীকে কবে এখানে নিয়ে আসছেন?"

—"যে কোনোদিন এসে যাবে। আমাকে ছেড়ে থাকা ওর পক্ষে বড্ডো কষ্টকর হবে।"

ঠাট্টা করে বলি—"আপনার দেখাশুনো করাও যে দরকার।"

—"খুব ঠিক কথা। তবে মার সেবাযত্ন আগে।"

—"মাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হয়। পাশিঘাটে আপনার কাছেই না আর মেয়ে থাকবে।"

—"খুব ভালো কথা। কিন্তু বুঝতেই পারছেন দিল্লীতে মা মানুষ হয়েছেন। তাঁর কি এ বয়সে পাশিঘাট ভালো লাগবে। মানে দীর্ঘ-কাল ধরে থাকতে উনি রাজী হবেন না। আমার স্ত্রীর কথা আলাদা। স্ত্রীর রয়েছি আমি। কিন্তু শাশুড়ী এ জঙ্গলে এসে কি করবে? আর আমার বদলির চাকরি। একদিন হয়তো নেফার আরো অভ্যন্তরে চলে যেতে হবে। ওঁর তখন কষ্ট হবে। সে কষ্টটুকু আমি দিতে চাইনে।"

—"আপনার বাগানে আর বারান্দায় ফুলের ছড়াছড়ি। কতোরকম ফুলের গাছ। আপনার শখ না আপনার স্ত্রীর?"

—"আমার শখ রয়েছে, কিন্তু যা দেখছেন তার জন্যে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সব কিছুর জন্যে আমার স্ত্রী দায়ী। সবটা কৃতিত্ব ওর প্রাপ্য।" বলে ভর্মা।

ভর্মার ফুল এবং লতাপাতার কালেকশান নিঃসন্দেহে সবাইকার প্রশংসা কুড়োবে। ফ্লাওয়ার ট্রী, ক্যাটালিয়া, সিনাবারিয়া, স্টোন ফ্লাওয়ার, প্যান্সি, গ্রাউণ্ড অর্কিড, লেডিস্ লেস্, বিগানিয়া, কস্‌মস্। এছাড়া গন্ধরাজ, বকুল, টগর, বেলফুল, যুঁই, চ্যামেলি, জবা, হাস্নুহানা, স্থলপদ্ম।

—"জানেন আমার স্ত্রী খুবই রূপসী।" মনে হলো মদের গুণে ভর্মা খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছে।

—"পাশিঘাটে উনি এলে আপনার কথা যাচাই করে দেখবো।" বলি আমি।

ভর্মা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। ভদ্রলোক স্ত্রী বলতে অজ্ঞান। বউকে বোধ হয় খুব ভালোবাসে। মনে মনে ভাবি ওর দোষটা কোথায়। এ অরণ্যে একলা থাকা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। বেচারার বউকে ঘন ঘন মনে পড়া স্বাভাবিক। তা বউ যখন রয়েছে এসেই যাবে একদিন। সমস্ত দুঃখের একদিন অবসান হবে। বউ-এর প্রশংসা অনেকেই করে। ভর্মা তাঁদেরই একজন। হয়তো ওর মাত্রাজ্ঞান একটু কম। এর পর ভর্মা সিয়াং এবং পাশিঘাটের আশেপাশের বাসিন্দা আদিদের সম্বন্ধে অনেক গল্প বলেছে। ওরা ছিলো ভীষণ উদ্ধত প্রকৃতি এবং স্বাধীনতাপ্রিয়। ব্রিটিশ শাসনকে একেবারে মানতে চাইতো না। বড্ডো জ্বালিয়েছে ব্রিটিশ কর্তাদের। আদিদের এর আগে "আবর" বলে ডাকা হতো। "আবর" নামটা ওদের ভীষণ অপছন্দ। "আবর" অর্থে যে শাসন মানে না। উদ্ধত এবং দুর্বিনীত। ওরা আপত্তি জানিয়ে কথাটা তুলে দিয়ে আদি কথাটা বেছে নিয়েছে। ভর্মার অভিজ্ঞতা কতো। ভর্মা আদিদের চলোঙ্‌ পন্নুং উৎসবে যোগ দিয়েছে। আদিদের কেবাঙ্‌-এ উপস্থিত থেকে ওদের বিচারপদ্ধতি দেখেছে। গ্রামের বৃদ্ধের দল ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তির ভেতর দিয়ে দোষীর গুণাগুণ বিচার করেছে। ভর্মা মসুপে গ্রামের অবিবাহিতদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে গ্রাম পাহারা দিয়েছে। অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ওদের ওই রকম ব্যবস্থা। ওদের মদ যা আপঙ্‌ বলে সবাই জানে এবং যা ভাত থেকে তৈরী হয় তাতে কতো গ্রাম ক্যালরি রয়েছে তা পর্যন্ত ভর্মার মুখস্থ। সেদিন পর্যন্ত নেফাতে কিরকম দাসব্যবসা চলতো তারই বর্ণনা দেয় ভর্মা। গভর্ণমেণ্ট নানা-রকম ভাবে দাসব্যবসা উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করছে। নানা কারণে একজন দাস হতে পারে। যুদ্ধে বন্দী হয়ে কেউ দাস হয়। কাউকে মিথোন বা

ঘটিবাটির বদলে কিনে নেওয়া হয়। কেউ ধার শোধ না করতে পেরে দাস হয়। কেউ দাসের ঘরে জন্ম নিয়ে সারাজীবন দাসত্বের জ্বালা ভোগ করে। আর কেউ কোনো মারাত্মক অপরাধ করে ফাইন দিতে না পেরে দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে জড়ায়। গরু, ভেড়া, মিথোন, এমন কি ঘটিবাটির বদলে দাস বিনিময় হয়। তন্ময় হয়ে ভর্মার কথা শুনছিলাম। তবে যুগ পালটাচ্ছে। নেফা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এখানে অনেক কিছু আজ আর সম্ভব নয়। নেফার অরণ্য ধীরে ধীরে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। অজানা, অচেনা বনভূমি, পাহাড় পর্বত প্রান্তর আস্তে আস্তে শাসনের আওতায় এসে যাচ্ছে। সরকার চেষ্টা করছে, তবে সময় নেবে। তবুও নেফার অভ্যন্তরে, দুর্গম গিরি গুহা জঙ্গলে, সীমান্ত অঞ্চলে হয়তো দাসব্যবসা এখনো চালু রয়েছে। কেউ হলফ করে কিছু বলতে পারে না। কথা বলতে বলতে ভর্মা বালিশের তলা থেকে একটা ছোট্ট চামড়ার তৈরী বাক্স বের করে। বোতাম টিপতেই বাক্সের ডালা খুলে যায় আর সেটা ওপরে তুলতেই চোখ ঝলসিয়ে যায়। একটা আংটি, আংটির হীরেটা জ্বলজ্বল করছে।

—"কলকাতা থেকে ওর জন্যে আনিয়েছি। এ বছর বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে ওকে এটা প্রেজেন্ট করবো।" ভর্মার কণ্ঠস্বর কেমন ভেজা-ভেজা। যাক কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছিলো। বিদায় নিয়ে সেদিনের মতো চলে আসি।

পরের দিন খবরটা ডি, সি-র অফিসে বসে শুনি। ডি, সি, আর একজন দুজন ছাড়া খবরটা বড়ো বেশী কেউ জানতো না। ভর্মার স্ত্রী মাসকয়েক হলো ভর্মাকে ডিভোর্স করেছে। ক্ষতিপূরণের ওপর কেউ জোর দেয়নি। ডিভোর্সের কারণ সম্বন্ধে ডি, সি কিছু বলেনি। কোর্ট মিসেস্ ভর্মার আবেদন মঞ্জুর করেছে। ভর্মা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। নিজের পুরুষত্বের ওপরে সে বোধকরি আস্থা হারিয়েছিলো।

॥ আট ॥

পাশিঘাট হাসপাতালের বেডে শুয়ে আমার হাতটা ওমি ময়াং চেপে ধরে। সে বলে—"নেনী ময়াং তোমাকে দেখতে পেলে খুশী হতো।" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ সে বলে—"আমি নেনীর কাছে যাবো।" সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসতে চায়। আমি বাধা দিই।

—"তুমি উঠতে চেষ্টা করো না।" বলি আমি।

—"কেন আমার কি হয়েছে?"

—"তুমি বিষ খেয়েছিলে।"

—"নেনী যে আমাকে বিষ খেতে বলেছিলো। অনেকদিন থেকেই সে আমাকে বিষ খেতে বলেছিলো। বলেছিলো তুই আগে বিষ খাবি। তারপর আমি খাবো। দুজনে বিষ খেয়ে মরবো। মৃত্যুর পর আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। কাগোলী জামুর ঘর থেকে যেদিন নেনীকে নিয়ে এসেছিলাম সেদিনও নেনী ওই এক কথাই বলেছিলো।" একটু চুপ করে থেকে ওমি হঠাৎ বুকটা চেপে ধরে বলে—"উফ্, কি যন্ত্রণা!"

নার্স এসে ওমিকে শুইয়ে দেয়। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। আমি ওমির মাথায় হাত বোলাতে থাকি। ওমি বলে—"জানো সেবারকার যন্ত্রণার তুলনায় এ যন্ত্রণা কিছুই নয়। গাঁয়ের লোকগুলো গুনে গুনে আমাকে চাবুক মেরেছিলো। সারা শরীরের মাংসপেশীগুলো চাবুকের ঘায়ে দড়ির মতো ফুলে উঠেছিলো। অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিলো। কিন্তু সব সহ্য করেছিলাম। সহ্য করেছিলাম নেনীর মুখের দিকে তাকিয়ে।" ওমি মুখের ভাব এমন করে যেন সে সেই মুহূর্তে সেই বেত্রাঘাতের কষ্ট অনুভব করছে।

—"ওরা তোমাকে চাবুক মারলে কেন?"

—"নেনীর জন্যে একটা পাথরের মালা চুরি করেছিলাম। মালাটা ছিলো কাগোলী জামুর মেয়ের। ওর মালাটা দেখামাত্র নেনী আবদার ধরলো মালাটা তার চাই। দুটো সাহেব ডিব্রুগড়ের চা-বাগান থেকে

এসেছিলো। তারাই মালাটা কাগোলী জামুর মেয়েকে দিয়েছিলো। কাগোলী জামু মেবোর পথে ওদের মালপত্তর টেনেছিলো।"

—"মালাটা দেখে বুঝি নেনীর খুব লোভ হলো?" প্রশ্ন করি আমি।

—"কাগোলী জামুর মেয়ে ওই মালাটা গলায় ঝুলিয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়। গর্বে মাটিতে তার পা পড়ে না। কি করে নেনী সে সব সহ্য করবে? তার মুখে ভাত ওঠে না। নেনী খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলে। তার সব চেয়ে প্রিয় ছিলো ভালুকের মাংস। ভালুকের মাংস আঙুল দিয়ে ছুঁয়েও সে দেখলো না। ওর অবস্থা দেখে মনটা আমার ভেঙ্গে গেলো। ভাবলুম মালাটা কাগোলী জামুর ঘর থেকে চুরি করে আনবো।" ওমি ময়াং পুরানো দিনগুলোর স্মৃতির ভেতর ডুবে রয়েছে।

—"চুরি করতে গিয়ে বুঝি ধরা পড়লে?"

—"হ্যাঁ, সব বলছি শোনো।"

আমাদের কথাবার্তা অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে চলেছে।

—"ঢুকে পড়লাম কাগোলী জামুর ঘরে রাতের অন্ধকারে। এক ঘরে সব শুয়ে আছে। ছেলে আর তার বৌ। কাগোলী জামু আর তার স্ত্রী। মেয়ে আর তার জামাই। মালাটা খুঁজে বের করতে বেশ সময় লেগেছিলো। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মালা নিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছি, ঠিক তখুনি কাগোলী জামুর ঘুম ভেঙ্গে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে অন্ধকারের ভেতর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে।"

—"তা হলে ওখানেই ধরা পড়লে?"

—"না, না। আমার শরীরে তখন একটুকরো সুতোও ছিলো না। তাতে জংলী গাছের রস সারা শরীরে মেখে নেওয়াতে কাগোলী জামু আমাকে জড়িয়ে ধরলেও টুক্ করে পাঁকাল মাছের মতো হাত গলিয়ে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে নেনীর কাছে। তুমি বিশ্বাস করবে না মিগম্, মালা গলায় ঝুলিয়ে নেনীর কি আনন্দ! বললে তোকে

আমি কাঠবিড়ালীর কলিজা রেঁধে খাওয়াবো। গিরগিটির স্যুপ করে খাওয়াবো। আমার মনটা যা ভালো লেগেছিলো। সেসব কথা তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না মিগম্।" আনন্দে ওমির ছোট চোখ দুটো নাচতে থাকে।

—"কাগোলী জামু পুলিসে খবর দিলে না?" প্রশ্ন করি।

—"পুলিস-টুলিস নয়। কাগোলী সোজা ধন্না দিলে দেওদারের কাছে।"

—"দেওদার কে?"

—"তাও জানো না তুমি! সে আমাদের পুরোহিত। পূজো করে। আত্মাকে পৃথিবীর মাটিতে ডেকে আনে। রোগ সারায়, ভূত তাড়ায়। গ্রামে তার অনেক প্রতিপত্তি। সে মিথোনের মাংস খায়। আপঙ্ গলায় ঢেলে মন্ত্র সুর করে পড়ে। তার অনেক কিছু করবার শক্তি রয়েছে।" ওমি থেমে যায়।

—"তারপর কি হলো?"

ওমি যা বলেছিলো তার সারাংশ এখানে তুলে ধরছি। মেবোর সে দিনটা ওমির এখনো স্পষ্ট মনে আছে। দেওদারের মুখটা গম্ভীর। মাটিতে পড়ে আছে কয়েকটা গলাকাটা মুরগী। রক্তের ধারার উপর রেখা টেনেছে দেওদার। সে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। মেবোর আশেপাশের গাঁয়ের সমস্ত লোক নির্ভর করছে দেওদারের গণনার ওপর। দেওদারের মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর। থম্থম্ করছে চারদিকের আবহাওয়া। দেওদার চারদিকে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর নেনী রয়েছে। ওমি রয়েছে। নেনীর হাত ওমি ধরেছে। ওমির হাতের ভেতর নেনীর হাত থরথর করে কাঁপছে। ওমি ভাবছে কেন সে হারটা চুরি করতে গেলো। দেওদারকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। ঝড় উঠবে নাকি? মেবোর জঙ্গলে হায়না ডাকছে। দেওদার চেঁচিয়ে বলে—"মালা যে নিয়েছো সময় থাকতে ফিরিয়ে দাও।

এখনো সময় আছে। যে মালা নিয়েছে আমি জানি সেই লোক এ ভিড়ের ভেতর রয়েছে।" সেই ভিড়ের ভেতর গুঞ্জন ওঠে। লোকজন চঞ্চল হয়ে ওঠে। দেওদার চেঁচিয়ে ওঠে—"এখনো সময় আছে, স্বীকার করো। করো স্বীকার। চুটে গামটে, পিরকু অপদেবতারা নেমে এলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। কেউ এ ধ্বংস রুখতে পারবে না। এখনো সময় আছে। আমি চারিদিকে সব অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আর গাঁয়ের অমঙ্গল হবেই যতোক্ষণ না গাঁয়ে চুরি বন্ধ হয়। চোর ধরা পড়ে। আমি এখনো সাবধান করে দিচ্ছি। বোলানের পাহাড়ে আজ কয়েকদিন ধরে শকুনিরা মৃত জীবজন্তুর দেহ স্পর্শ করেনি। এর কারণ কি? সিরকি আর তুরাকরণের জলে মরা মাছ ভেসে উঠছে কেন? লিম্বুকরণের দুধারের জঙ্গলের সব গাছ মরে যাচ্ছে কেন? এসবের কারণ গাঁয়ের লোক অসৎ হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে। সেই জন্যে অপদেবতার দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে চারদিকে অমঙ্গলের চিহ্ন। দেওদার বোঁ বোঁ করে পাক্ খেয়ে ঘুরতে থাকে। মুরগীর দেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে চাপ বেঁধেছে। দেওদার একটা ছোট্ট পাথরখণ্ডের ওপর নিজের হাত স্পর্শ করে মন্ত্র পড়তে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই পাথর নড়তে শুরু করে। সমবেত জনতা আনন্দে চীৎকার করে ওঠে।

বিস্ময়ে আনন্দে তারা অভিভূত। পাথর প্রথমে নড়তে শুরু করলে। তারপর চলতে শুরু করে। সঙ্গে চলেছে দেওদার। তার হাত পাথর স্পর্শ করে রয়েছে। পাথর গড়িয়ে চলেছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। সঙ্গে দেওদার, পেছনে বিস্মিত বিমূঢ় জনতা। পাথর গিয়ে যেখানে থামবে সেখানেই পাওয়া যাবে অপরাধীর সন্ধান। ওমি আর নেনী দেওদারের পেছনে চলেছে। ওমির ভয়ে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। ওই পথেই তার ঘর। পাথর চলতে চলতে যদি তার ঘরের কাছে থেমে যায়? তাহলে উপায়? নেনীর গলা থেকে মালাটা খুলে সে আগেই পাহাড়ের এক গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলো। পাথর এবার ভীষণ জোরে গড়িয়ে চলেছে। দেওদার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। জনতা চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। দেওদার মন্ত্র

পড়ছে ভীষণ জোরে জোরে। দেওদার পেছন ফিরে মাঝে মাঝে নেনীর দিকে তাকাচ্ছে। নেনী তাকাচ্ছে দেওদারের দিকে। ওমি ভাবে ওর দিকে দেওদার এতো ঘন ঘন তাকাচ্ছে কেন? নেনীর কোনো অমঙ্গল হবে না তো? দেওদার বার বার নেনীর দিকে তাকায় কেন? ওমি স্বীকার করবে নাকি তার দোষ! যা ভেবেছিলো ঠিক তাই। ওমির বাঁশের ঘরের কাছে এসে পাথর থেমে যায়। সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে ওঠে। দেওদার তাকায় নেনীর দিকে। নেনী তাকায় দেওদারের দিকে। ওমি ভাবে পাথর যেখানে খুশি থেমে যাক, শুধ্ দেওদার তার ওই সর্বনাশা দৃষ্টি থেকে নেনীকে মুক্তি দিক। ওমি আর ভাবতে পারেনি। জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওমির ওপর। একটি মুহূর্তের জন্যে ওমি দেখতে পায় দেওদারের দৃষ্টির সঙ্গে নেনীর দৃষ্টি বিনিময়। চোখের তারায় তারায় ইঙ্গিত আর ইশারার আদান-প্রদান। তুজনের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ঝিলিক। ওমি দেওদারকে হাতের কাছে পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতো। জনতা ওমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওর কাছে মালা আছে কি নেই সে সব তাদের জানবার দরকার নেই। পাথর এসে ওমির বাড়ির কাছে থেমেছে। ওটুকুনই যথেষ্ট। কিল, চড়, লাথি, আঁচড়, কামড়—যে যা পেরেছে অকাতরে দান করেছে। ওরা ওমিকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। তারপর ওরা ওমিকে টানতে টানতে নিয়ে চলে কেবাঙ্-এ। কেবাঙ্-এ গাঁয়ের বয়স্ক ব্যক্তিদের সভা বসবে। আর সেই সভাতে ওমির বিচার হবে। মারের চোটে ওমির মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে চোখের পাতা তুটো বারে বারে বুজিয়ে দিচ্ছিলো। তবু এর ভেতর এক ফাঁকে সে তাকিয়ে দেখে দেওদার নেনীর মুখে আপঙ্ ঢেলে দিচ্ছে। কাগোলী জামু আনন্দে নেনীকে জড়িয়ে ধরেছে। জড়িয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। একটা আহত সিংহের বিক্রম নিয়ে সে জনতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে কাগোলী জামুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলো। কিন্তু নিজেকে সে ওদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারলে

না। যে বাড়িতে কেবাঙ্ বসবে তাকে বলা হয় মোরাং। কেবাঙ্-এর বিচার দেখবার জন্যে সমস্ত গাঁখানা ভেঙ্গে পড়েছে। ওমিকে একটা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। গ্রামসভা ঠিক করবে তার কি ধরনের শাস্তি হবে। গ্রামের প্রবীণ এক ব্যক্তি ক্যাগোলী জামুর পক্ষ নিয়ে সব কিছু বলে যেতে শুরু করলে। এ ঠিক বলা নয়। যেন বিরাট একটা কবিতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুর করে আওড়িয়ে যাচ্ছে। একটানা একঘেঁয়ে একটা সুর। সাক্ষীসাবুদের অভাব হলো না। ওমিকে মালা সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো। ওমি কিছুই বললে না। মালার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে জানালে মালা তার কাছে নেই। হুকুম হলো ত্রিশ ঘা বেতের। বেত শরীরে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে ওমির ফেনা গড়াচ্ছে। তবুও ওমি মালার খোঁজ দেয়নি। বেত চলেছে একটার পর একটা। দয়া নেই, মায়া নেই। বিশ ঘা বেতের পরে ওমি অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার আর কিছুই মনে নেই। ধীরে ধীরে সব ঝাপসা হয়ে এসেছিলো। মেবোর পাহাড়, জঙ্গল সব ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এর পর কতোক্ষণ কেটে গেছে সে জানে না। একসময় তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। মেবোর প্রান্তর তখন জনশূন্য। কাছেপিঠে জঙ্গলে আর পাহাড়ে হায়না ডাকছে। ঘন ঘন ফেউ ডাকছে। গাঁয়ের কুকুরগুলো কি বিশ্রীভাবে কাঁদছে। তাকে মৃত মনে করে মেবোর জঙ্গলে শকুনিগুলো ডানার ঝাপটা দিচ্ছে ঘন ঘন। শেয়ালগুলো একবার এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। তাদের জিহ্বা দিয়ে লালা ঝরছে। ধারেকাছে কেউ কোথাও নেই। খানিকটা জল মুখে তুলে দেবে এমন একটি লোক পর্যন্ত আশেপাশে নেই। বেতটা মাংস কেটে কেটে বসে গেছে। অসম্ভব রকম রক্তস্রাব হচ্ছে। অনেক কষ্টে ওমি উঠে দাঁড়ায়। কি যন্ত্রণা, বাপ্! কোনো রকমে টলতে টলতে গিয়ে একটা স্রোতস্বিনীর জলে সে লাফিয়ে পড়ে। বরফগলা জল। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা করে দেয়। নেনীটা কোথায় গেলো? সে রওনা দিলে নেনীর খোঁজে। সন্ধ্যার অন্ধকারে

সারাটা গাঁ সে খুঁজে দেখলে, কোথাও নেনী নেই। না, কোথাও নেই। গাঁয়ের লোকেরা তাকে দেখে হাসলে। টিট্‌কিরি দিলে। থুথু ফেললে। ওমির শরীরে তীব্র ব্যথা। মনে দুর্জয় ক্রোধ। আবার সেই সঙ্গে অসম্ভব অভিমান। একবার ভাবলে দেওদারের কাছে ছুটে যায়। সে হয়তো গুনে নেনীর খবর বলে দিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের এক যুবক তাকে সমস্ত খবর দিলে। নেনী রয়েছে কাগোলী জামুর ঘরে। পৃথিবীটা চোখের সামনে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে থাকে পাহাড়, পর্বত। নদী প্রান্তর সব কিছু ঝাপসা দেখতে থাকে ওমি। এর পর ওমি ছুটতে থাকে পাগলের মতো। হাতে তার ধরা রয়েছে মস্তো বড় একটা ছুরি। ঝক্‌ঝক্ করছে এক বিরাট ছুরি।

জিমি, পিরটে, ওমাইউ দেবতা আর অপদেবতা সবাইকে ডেকে সে বলেছে তাকে ক্ষমা করতে। ছুরি বসাবে সে কাগোলী জামুর বুকে। শাস্তিস্বরূপ নেনীর একটা অঙ্গ, হয় হাতের আঙুল নয়তো পায়ের পাতা সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ওই শাস্তিই নেনীর প্রাপ্য। ভীষণ জোরে দৌড়িয়ে সে কাগোলী জামুর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপরই পায়ের নীচের মাটি দুলতে থাকে। গুরগুর গুরগুর করে এক অদ্ভুত শব্দ। তারপর মাটি দু-ফাঁক হয়ে যেতে থাকে। গুরগুর গুরগুর আবার সেই ভীষণ! ভয়ঙ্কর শব্দ। কেঁপে ওঠে মাঠ আর প্রান্তর। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে। পৃথিবী দুলতে থাকে। দেবতা, অপদেবতারা কি ওমির প্রার্থনা শুনলো? মাটি দুলছে। চলার শক্তি নেই ওমির। সে মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে রইলো। এতো অত্যাচার! এতো অন্যায়! এতো পাপ! ধ্বংস হয়ে যাবে এ পৃথিবী। আবার গুরগুর গুরগুর শব্দ! একটা পাহাড়ের চূড়ো তার চোখের সামনে পাহাড় থেকে আলগা হয়ে মাটিতে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো অসংখ্য জীবজন্তুর মরণ-চীৎকার। কারো রক্ষা নেই। বাড়িঘর, গাছপালা নিয়ে সামনের পাহাড়টা ভেঙ্গে পড়লো। মরণ-চীৎকারে আকাশবাতাস মুখরিত।

ওমির হঠাৎ খেয়াল হলো নেনীকে বাঁচাতে হবে। যে করে হোক নেনীকে বাঁচাতে হবে। মাটি থেকে উঠে সে আবার কাগোলী জামুর ঘরের দিকে ছুট লাগায়। মাটি কাঁপছে। ওমির পা কাঁপছে। কি অসম্ভব ধুলোবালি উড়ছে! আকাশটা ধুলোবালিতে ঢেকে গেছে। চাঁদটাও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। একপাল হরিণ প্রাণভয়ে এদিকে দৌড়িয়ে এসেছিলো। তাদের পায়ের নীচেকার মাটি হঠাৎ ফেটে দুভাগ হয়ে গেলো। আর সেই বিরাট গর্তের ভেতর দিয়ে গোটা হরিণের দলটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। যাবার আগে সে কি ভীষণ চীৎকার। বিরাট বিরাট সব গাছ আশেপাশে ভেঙ্গে পড়ছে। তবুও মাতালের মতো টলতে টলতে ওমি চলেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক। নেনী শুধু বেঁচে থাক।

মাটির তলা থেকে ফাটল দিয়ে বগ্‌বগ্‌ করে জল উঠছে গরম জল। টগ্‌বগ্‌ করে যেন ফুটছে। আর তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আকাশে বাতাসে কি বিশ্রী একটা গন্ধ! কাগোলী জামুর ঘরে পৌঁছুতে গেলে একটা ছোট্ট নদী পার হতে হয়। সে আশ্চর্য হয়ে দেখলো নদীটার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই, সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাগোলীর ঘরে পৌঁছে সে দেখে কাগোলীর থেঁতলানো দেহটার পাশে নেনী অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। নেনার মাথা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। নেনীর অজ্ঞান দেহটা কাঁধে করে সে দৌড় শুরু করেছিলো। কতোক্ষণ দৌড়েছিলো তার খেয়াল নেই। ততোক্ষণ কম্পন বন্ধ হয়েছে। কিন্তু যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই ধ্বংসের চিহ্ন। সে সারারাত একটু একটু করে চলতে চলতে একসময় সিয়াং-এর ধারে পৌঁছে গিয়েছিলো। পথ নেই, ঘাট নেই। সিয়াং-এর জলধারা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। একটা বিরাট পাহাড় ভেঙ্গে সিয়াং-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তাতেই সিয়াং-এর জলস্রোত চলবার পথে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। জলের রং বদলে ঘোর কালো হয়ে গেছে। জলের ওপর হাজার হাজার মাছ মরে ভেসে উঠেছে। সিয়াং-এর বুক থেকে ধোঁয়া উঠছে। কি যেন

সব মিশেছে জলের সঙ্গে। একটা বিরাট মৃত বাঘ আর একটা মৃত হাতীকে সে সিয়াং দিয়ে ভেসে যেতে দেখলো। ভোর হলো। বহু আকাঙ্ক্ষিত এ সকাল। আবার সেই মিষ্টি নরম আলো। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। নেনী চোখ মেলে চেয়েছে। ওমি ওকে বুকে জড়িয়ে রয়েছে। আবার শ্যামা, দোয়েল, কোকিল গাইছে। গত রাত্তিরের সমস্ত বিভীষিকা কেটে গেছে। দেওদারের সেই ভীষণ মুখখানা মন থেকে মুছে গেছে। নেই কাগোলী জামুর সেই পৈশাচিক হাসি। ওমি ভুলে গেছে জনতার মার। চাবুকের ঘা। সে ভুলে গেছে রাতের সেই ভয়ঙ্কর ভূকম্পন। পৃথিবীর সেই বারে বারে কেঁপে ওঠা। পাহাড়ের চূড়ো ভেঙ্গে পড়া। হরিণের সেই আর্ত চীৎকার। কিছু নেই। সব থেমে গেছে। আর কোনো ভয়ের কারণ নেই। সব মন থেকে মুছে গেছে। মনে হচ্ছে ভগবান তার সমস্ত যন্ত্রণা মুছিয়ে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে পৃথিবী কি সুন্দর। নেনী কি সুন্দর। শত শত পাহাড় গুঁড়ো হয়ে যাক। নদীর মুখ শুকিয়ে যাক। প্লাবন হোক। হাতির পাল, হরিণের পাল মাটির গহ্বরে হারিয়ে যাক। ওমির তাতে কি যায় আসে, নেনী রয়েছে তার বুকে। ভোরের সোনালী আলো, ফুরফুরে হাওয়া চমৎকার। মধুর। তবে সিয়াং-এর বুকে এ গুরুভার। সিয়াং বাঁচবে তো ? দরকার হয় ওমি তার দেহের রক্ত সিয়াং-এর বুকে ঢেলে দেবে তাতে যদি সিয়াং খুশী হয়, তার শান্তি হয় ! সিয়াং আদিদের দেবতা।

ওমির গল্প খুব মনোযোগ দিয়ে সেদিন শুনেছিলাম। শুনেছিলাম হাসপাতালের বেডে ওমির পাশে বসে। এরপর নার্স এসে ওমির কথা বলা বন্ধ করে দিলে। আমাকে অনুরোধ করলে বিদায় নিতে। রোগী উত্তেজিত হলে তার শরীরের পক্ষে খারাপ হবে। বাড়িতে পৌঁছে কাগজপত্তর ঘেঁটেছিলাম। ১৮৯৭ সালের আসামের ভূমিকম্পের চাইতে ১৯৫০-এর ভূমিকম্প অনেক বেশী জোরালো। সমস্ত নেফার চেহারাটা নাকি এ ভূমিকম্প পালটিয়ে দিয়েছিলো। অদৃশ্য হয়েছিলো অনেক নদী, গিরি, প্রান্তর আর জনবসতি।

॥ নয় ॥

থ্রী নোট্রামস্! বরফুকনটা পাগল নাকি? হাতে তাস নেই মোটেও, কি যা-তা সব ডাকছে! চমকায় মিস্টার দাস। আর চমকায় মিস্টার মদন আর সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার সেনগুপ্ত। পশুর ডাক্তার সেনগুপ্ত। তার বাড়িতেই আজ সন্ধ্যের পর তাসের আড্ডা বসেছে। আড্ডা দেবার দিন শনিবার আর রবিবার। এক শনিবার সেনগুপ্তর বাড়িতে জমায়েত হলে পরের শনিবার ওরা হাজির হয় মদনের বাড়িতে। এক রবিবার যদি দাসের বাড়ি, তবে পরের রবিবার বরফুকনের বাড়ি। সঙ্গে থাকে গৃহিণীরা। আজও তারা উপস্থিত। শুধু আড্ডা দেওয়া আর তাস খেলা নয়। খাবারের ব্যবস্থা থাকে। সঙ্গে থাকে ড্রিঙ্কস। অফিসে কাজ আর কতোটুকুন। পার্টি আর পিক্‌নিকের ছড়াছড়ি। ওসব ছাড়া নেফা সার্ভিস করাই মুশকিল হতো। কর্তারা কাজ করে পলিটিক্যাল, মেডিক্যাল, সি. পি. ডবলু ডি. আর এডুকেশন অফিসে। গিন্নীরা ঘোরে সর্বত্র। সারা পাশিঘাট চষে বেড়ায়। দাস তাস ফেলে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ড্রিঙ্কস-এ চুমুক দিচ্ছে একটু একটু করে। মিসেস্ সেনগুপ্ত ঝুঁকে রয়েছে মদনের ঘাড়ের ওপর। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে মদনের ঘাড়ে গলায় ঘন ঘন। মিসেস্ মদনের গা থেকে সেণ্ট আর পাউডারের গন্ধ উড়ছে। বরফুকনটা সব সময় সর্বনেশে ডাক দেয়। তাসের আসরে বসে ভুলে যায় যে গুনে গুনে পয়সা ফেলতে হবে। ও ভীষণ বেপরোয়া আর ডানপিটে। ঐতিহাসিকদের মতে ওর রক্তে অনেক রক্ত মিশেছে। অস্ট্রোএসিয়াটিকস্। দ্রাবিদিয়ানস্। টিবেটো-বার্মান। মঙ্গোলয়েডস্ আর এরিয়ানস্। অসম ইতিহাসে দেখা যায় ফুকনরা ছ হাজার সৈন্যের কর্তা ছিলো। স্ত্রীরা প্রসাধনে, ব্লাউজ আর শাড়িতে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করেছে। মিসেস্ মদনের বব্ করা চুল থেকে কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। সেনগুপ্ত ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানছে। মিসেস্ মদন আঙুলের ডগায় একটা সিগারেট ধরে আছে। মিসেস্ মদন ধূমপানে

অভ্যস্ত। মিসেস্ দাস লুকিয়ে লুকিয়ে ইদানীং সিগারেট টানবার আর্টটা রপ্ত করেছে।

—"থ্‌্রী নোট্রামস্!"

বরফুকনের ডাক শুনে মিসেস্ মদন বলে ওঠে, "মাই ডিয়ার! মাই ডিয়ার!"

এটা বলা তার একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। সেনগুপ্ত এক-ফাঁকে মিসেস্ বরফুকনকে দেখে নেয়। জোড়হাটের মেয়ে। হলুদ গায়ের রং। অদ্ভুত সুন্দরী। ঠোঁটের পাশে তিলটায় সৌন্দর্য যেন অনেক বাড়িয়েছে। তার লোকাট ব্লাউজের আড়ালে চলেছে স্পর্ধা আর আস্পর্ধার সদন্ত আস্ফালন।

—"আজকে কিন্তু মাংস নেই।" বলে সেনগুপ্ত।

—"হোপলেস্।" সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে মিসেস্ বরফুকন আর দাস।

আলি সাহেবের অর্ডার দেওয়া পাঁঠা-খাসী আজ ওরাং বাটুর নৌকোয় পাশিঘাট পৌঁছুতে পারে নি। ব্রহ্মপুত্র ফুলে ফেঁপে একাকার। নেফার বৃষ্টির জলের সবটুকু নেমে আসে ব্রহ্মপুত্রে। আর সেই জন্যে ব্রহ্মপুত্র ঘন ঘন ডিব্রুগড়কে শাসায়। ব্রহ্মপুত্রের রক্তচক্ষু দেখে ডিব্রুগড় কাঁপে থরথর করে।

ওরাং বাটু আর জাওলাপ্রসাদের নিজেদের বোট রয়েছে। বোটে ছোট্ট মোটর ফিট্ করা। ওদের বোট ডিব্রুগড়ের ঘাট থেকে পাড়ি দেয় পাশিঘাটের উদ্দেশ্যে। যাবে ওইরাম ঘাট পর্যন্ত। ফট্‌ফট্ করে শব্দ করতে করতে বোট জল কেটে এগিয়ে যায় নব্বুই মাইল পথ। ওইরাম ঘাট থেকে বাসে বা জীপে পাশিঘাট। জংলাপথে অনেকটা দূর অতিক্রম করলে তবে পাশিঘাটে পৌঁছুনো যায়। সপ্তাহে তিন দিন বোট যাতায়াত করে। পাশিঘাটের লোকজন নৌকো ঘাটে পৌঁছুবার আশায় হা করে চেয়ে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে বোঝাই হয়ে বোট জল কেটে পাশিঘাটের পথে পাড়ি জমায়। নৌকোয় কি নেই? লোকজন, মুরগী, পাঁঠা-খাসী, জীপ, সাইকেল, গরু, কয়লা,

লোহা, কাঠ, খবরের কাগজ, আলু-পটল। সব মিলেমিশে একাকার। এক একটা বছর বর্ষা যে ভীষণ রূপ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে তা মার্চ মাস থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে নিয়ে আসা তখন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেসময় প্লেন নামবে না, নৌকো পনেরো দিনে একদিন ওইরাম ঘাট পৌঁছুবে কিনা সন্দেহ। তারপর পাহাড়ী পথে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মাল পাশিঘাটে নিয়ে আসা। সেও কম কষ্টকর ব্যাপার নয়। পাশিঘাট সভ্য জগতের সংস্পর্শ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন সারা পাশিঘাটের লোকগুলো নির্ভর করবে জাওলাপ্রসাদের মার্বেলের মতো ছোট ছোট শুকনো আলুর ওপর, আর ওরাং বাটুর ছাতা-পড়া মুসুরির ডালের ওপর। ছ'মাসেরও ওপরে হয়ে গেছে ওরাং বাটু ডাল এনে ঘরে মজুত করেছে। স্যাঁৎসেঁতে ময়লা নোংরা ঘর। ততোদিন ডালে পোকামাকড় ছেয়ে গেছে।

ব্রহ্মপুত্র ডিব্রুগড়কে ধীরে ধীরে খেয়ে শহরের ভেতরে ঢুকছে। কোনো রকমেই নদীকে শাসন করে বাগমানানো যাচ্ছে না। তারের নেটে পাথর বোঝাই করে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ফেলা হচ্ছে। ডিব্রুগড়কে বাঁচাতে হবে। এর আগে নেট ছাড়াই পাথর ফেলা হয়েছিলো। কত লক্ষ পাথর ফেলা হয়েছিলো এবং কিভাবে ফেলা হয়েছিলো তার দিকে কেউ নজর রাখেনি। হাজার আর লক্ষের মধ্যে দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করেনি। টাকার অঙ্কের বহর দেখে কর্তাদের চোখ ছানাবড়া। কিন্তু ততোদিনে পাথর জলের তলায় অদৃশ্য হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জলে গেছে অনেক টাকা। ব্রহ্মপুত্র সমস্ত পাথর খেয়ে বসে আছে। হিসেবনিকেশের বাইরে চলে গেছে সমস্ত কিছু। অতো পাথর জলে ফেলা হয়েছে কিনা সে বিষয়েই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করলো। দুজন ওভারসিয়ার, চারজন কন্‌ট্রাক্টারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ হলো।

পাথর খেয়ে ব্রহ্মপুত্রের পেট মোটেও ভরলো না। তার দাপট

বাড়লো। ডিব্রুগড়ের রক্ষার কাজ মোটেও এগুলো না, এবার তাই নেট্‌বন্দী পাথর ব্রহ্মপুত্রের তীরে ছড়ানো হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্রকে রুখতে হবে। জাওলাপ্রসাদ গোঁড়া হিন্দু। সে তার নৌকোয় পাঁঠাখাসী আনবে না। জাওলাপ্রসাদের দোকানে জিনিসপত্রের দাম ভীষণ চড়া। দু'টাকার বিস্কুটের টিন আট থেকে দশ টাকায় বিক্রী হয়। জাওলাপ্রসাদের সঙ্গে ওরাং বাটুর ভীষণ প্রতিযোগিতা। জাওলা-প্রসাদের নৌকো যাতে ব্রহ্মপুত্রে ওলটায় সেজন্যে চুটে গামটের কাছে ওরাং বাটু বেশ কয়েকবার মানত করেছে। ওরাং বাটুর মোটরবোটে তেল আর মবিল অয়েলের দরকার হলে জাওলাপ্রসাদ সব কিছু সরিয়ে রাখে। সঞ্চিত তেল আর মবিল অয়েল লুকিয়ে রেখে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলে—"ভাই, ওসবের এককণাও আর অবশিষ্ট নেই। আনতে হবে ডিব্রুগড়ের বাজার থেকে।" সে মনে মনে ভাবে ওরাং বাটুর বোট অচল হয়ে পড়ে থাক না কয়েকদিন। তখন পাশিঘাটের ঘরে ঘরে জাওলাপ্রসাদের খোঁজ পড়বে। স্বয়ং ডি. সি. মানে পাশিঘাটের ডেপুটি কমিশনার জাওলাপ্রসাদের খোঁজখবর করবে। দামী কাপড়ে মোড়া সোফাতে জাওলাপ্রসাদ তার রোদ্দুরে ফেটে যাওয়া আর বর্ষাতে ছাতা পড়া পা দুখানা তুলে বসলেও ডি. সি. আপত্তি করবে না। ডি. সি-কে প্রয়োজনে অনেক জিনিসপত্তর ডিব্রুগড় থেকে আনাতে হবে। জাওলাপ্রসাদ তার শ্যালকের একটা বিজনেস পারমিটের জন্য ডি. সি-র পেছনে অনেকদিন থেকে ঘোরাফেরা করছে। নেফাতে বিজনেস করবার পারমিট পাওয়া খুব মুশকিল। ইনার লাইন। পারমিশান আর পারমিট ছাড়া ব্যবসা করা অসম্ভব। পাস আর পারমিট ছাড়া নেফাতে ঢোকাই মুশকিল। শিলং সেক্রেটারিয়েট থেকে পারমিশান আর পারমিট আনাতে হবে ডি. সি-র নোটের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। জাওলাপ্রসাদ জানে মাসখানেক ওরাং বাটুর বোট অচল হয়ে পড়ে থাকলে তার কাজ সহজে হাসিল হবে।

নেফার বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা এ লোকটাকে ওরাং

বাটু কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ওর সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধিতে সে কিছুতেই পেরে ওঠে না। কিন্তু এদিকে তার ধমনীতে বইছে আবার রক্ত। শাসন মানে না। বন্য আর উদাস। সাহেবদের আবররা বড্ডো জ্বালিয়েছে। বছর বছর সাহেবদের হত্যা করেছে তারা। অনেকেই বলেছিলো আবর্ নামটা ট্রাইবস্‌দের মোটেও পছন্দ নয়। তাই আজকে সবাই তাদের আদি বলে ডাকে। ওরাং বাটু দুবার চেষ্টা করেছে তার নৌকো নিয়ে জাওলাপ্রসাদের নৌকোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। সংঘর্ষ বাধিয়ে চেষ্টা কবেছে জাওলাপ্রসাদের নৌকো ডুবিয়ে দিতে। দুবারই সে বিফল হয়েছে। তবে রাতের অন্ধকারে গিয়ে বোটের মোটর নষ্ট করে রাখা, তেল চুরি করে বোটকে পঙ্গু করে দেওয়া নানারকম অসুবিধের সৃষ্টি করে যাতায়াতের বাধাবিঘ্ন ঘটানো—এসব অহরহ দুজনে করছে। যতোদিন জঙ্গলের পথে নূতন নূতন সড়ক না বেরুবে, জীপ আর বাস চলাচলের পথ সুগম না হবে, প্লেন ঘন ঘন পাশিঘাটে না নামবে ততোদিন দুজনের এ রেষারেষি, এ দ্বন্দ্ব চলবে। ভুগবে পাশিঘাটের লোকগুলো। আর এসব অসুবিধার পূর্ণ সুযোগ নেবে ওরাং বাটু আর জাওলাপ্রসাদ।

—"আমাদের মুরগী চাই! মুরগী চাই!" সম্মিলিত কণ্ঠধ্বনি।

—"মুরগী পাওয়া যাচ্ছে না। কি একটা অজ্ঞাত রোগে পাশিঘাটের মুরগীগুলো সার্ভিস না দিয়েই মারা পড়ছে। ওষুধ সময়মতো ডিব্রুগড় হাসপাতাল থেকে না এসে পড়াতেই এ বিপদ।" বলে সেনগুপ্ত।

মিসেস্ দাস তাকিয়ে থাকে মিসেস্ মদনের দিকে। মিসেস্ দাস মিসেস্ মদনকে সমস্ত ব্যাপারে অনুকরণ করে। ওর সঙ্গে সে সমস্ত কিছুতে পাল্লা দিতে চায়। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। সর্ব বিষয়ে ওকে অনুকরণ করে।

মিসেস্ মদন দিল্লীর মেয়ে। অল্পবয়স থেকে অনেক কিছু সে দেখেছে। ক্লাব, পার্টি অনেক করেছে। এসব ওর কাছে নূতন নয়। মিসেস্ দাসের স্বামী নেফাতে চাকুরি নেবার আগে কলকাতার বাইরে

মফঃস্বলের এক কলেজের লেকচারার ছিলো। মিসেস্ দাস হাত-পা পুড়িয়ে রান্না করেছে। বাটনা বেটে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, হাত-পা-এর আঙুলগুলোর অবস্থা কাহিল করে তুলেছিলো। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘা হয়ে গিয়েছিলো। হাওড়ার এক অখ্যাত গলিতে স্বামী-স্ত্রী থাকতো। কলকাতায় বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় বেড়াতে এলে বাড়িঘরগুলোর দিকে মিসেস্ দাস হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। ড্রইংরুম, গাড়ি, বাগান, দারোয়ান, খানসামা, বেয়ারা দেখে মিসেস্ দাস দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। অতি আধুনিকাকে দেখে দেখে তার আর আশ মিটতো না। নিজে সুন্দরী সে কোনোকালেই ছিলো না। রং তার ময়লা, অতি সাধারণ চেহারা। কিন্তু সুন্দরীর প্রতি তার দুর্বলতা পুরুষমানুষের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। মাজাঘষা ফিটফাট চেহারার আধুনিকাদের দেখে মিসেস্ দাস স্বপ্নের রঙীন জাল বুনতো। মিস্টার দাস যখন সেক্সপীয়ারের গ্রন্থ নিয়ে মেতে রয়েছে তখন মিসেস্ দাস সতৃষ্ণনয়নে দেকানের শোকেস্‌গুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সেই দাস পাশিঘাটের পলিটিক্যাল অফিসের চাকরির জন্যে দরখাস্ত করে দিন গুনতে শুরু করলে। চাকরি শেষ পর্যন্ত তার হলো। মিসেস্ দাসের পীড়াপীড়িতে এ চাকরি নেওয়া। মাইনে ভালো। সুযোগ-সুবিধে অনেক রয়েছে। চমৎকার বাড়ি। বাগান। একটা জীপ, চাকর, বেয়ারা। ড্রইংরুম, পার্টি, পিকনিক। মিসেস্ দাস ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে, নখে রং লাগিয়ে, কাজল, কুমকুম, টিপ ব্যবহার করে অতিমাত্রায় আধুনিকা হবার চেষ্টা করলে। সে কলকাতায় গিয়ে চুল বব্ করে এসেছে। মিসেস্ দাস ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তুলছে। আর সেজন্যে তাকে অনেক মেহনত করতে হচ্ছে। কলকাতায় আর হাওড়ায় যা হয়নি, এখানে এসে সেসব কিছু ধীরে ধীরে হচ্ছে। সিগারেট টানতে গেলেই ভীষণভাবে সে কাশতে শুরু করে। ওটা না টেনে আঙুলে ধরে রাখা অনেক ভালো। আদব-

কায়দার ঘোলাজলে হাবুডুবু খাচ্ছে মিসেস্ দাস। সিগারেটের চাইতে আবার ড্রিঙ্কস ভালো। মিসেস্ দাস নিজের পা দুটো আলগোছে বয়ের আর বেয়ারার কোলে চাপিয়ে দেয়। ওরা পায়ের আঙুলগুলো জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। আবার কখনো টেনে বের করে আনে। পাশিঘাট মিসেস্ দাসকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে। তবে দুঃখ এটুকুনই যে এ নেফার পাশিঘাট। কলকাতা, দিল্লী, বম্বে নয়। এখানে দেখবার লোকের অভাব।

—"পাশিঘাটে ফ্রুটসের বড্ডো অভাব!" বলে মিসেস্ মদন।

—"আর আজকাল ড্রিঙ্কসেরও ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে।" মিসেস্ দাস বলে। সে মিসেস্ মদনের কাছে কোনোরকমেই পরাজয় স্বীকার করবে না।

মিস্টার দাস চমকায়। হাওড়ার গলির শাকচচ্চড়ীতে পুষ্ট মিসেস্ দাস অনেক দূর এগিয়েছে। আরো কতোদূর যাবে কে জানে! ভাবে মিস্টার দাস।

—"জানো মদন, উনি বম্বেতে খুব ভালো একটা অফার পেয়েছিলেন। খুব বড়ো চাকরি।" বলে মিসেস্ দাস।

—"চাকরিটা নিলেন না কেন?" প্রশ্ন করে মিসেস্ মদন।

—"আমাদের কি শুধু টাকা দেখলে চলে। আমরা কি শুধু টাকার জন্যে নেফায় এসেছি। নেফায় এসেছি দায়িত্বপালন করতে। উদ্দেশ্য এখানে কিছু ভালো কাজ করা। উদ্দেশ্য ট্রাইবগুলোর উন্নতিসাধন। ওদের ফেলে চলে যেতে মন চায় না। ওদের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। রয়েছে দায়িত্ব।" বলে মিসেস্ দাস।

মিস্টার দাস রুমাল নিয়ে ঘন ঘন কপালে বোলায়। ঘাম রয়েছে কিনা সেদিকে খেয়াল নেই। সেনগুপ্ত তাস থেকে চোখ তুলে মিসেস্ বরফুকনের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। লোকাট ব্লাউজের অন্তরাল থেকে যৌবনের হাতছানি। সেনগুপ্ত হার্টের ডাক দেবে। কিন্তু তার আগে তার নিজের হার্টটা বড্ডো-দুর্বল মনে হচ্ছে। মিসেস্

সেনগুপ্ত প্লেট সাজাচ্ছে। ওমলেট্, পেঁয়াজের বড়া, চিঁড়েভাজা, সন্দেশ।

—"কাল আমরা কোথায় মিলিত হচ্ছি?" জিজ্ঞেস করে মিসেস্ বরফুকন।

—"কেন? মেবোর ডাকবাংলোতে। ওখানেই পার্টির বন্দোবস্ত হয়েছে।" জবাব দেয় মিসেস্ সেনগুপ্ত।

—"সঙ্গে সুইমিং কস্টিউম নিতে ভুলো না যেন।" বলে মিসেস্ দাস।

মিসেস্ সেনগুপ্তের দেহে চর্বির আধিক্য রয়েছে। হনলুলু, পুরী, বম্বের বীচে মিসেস্ সেনগুপ্ত ওসব পরিধান করে আবার অবতীর্ণ হলে লোকজনের ভিড় হতো। একটা নূতন কিছু দেখবার আশায় কৌতূহলী জনতা তাকে হয়তো ঘিরেই ফেলতো। ভিড় সামলাবার জন্যে পুলিসকে হয়তো শেষ পর্যন্ত লাঠি চার্জ করতে হতো। নেফার অরণ্যে সে অসুবিধে নেই।

মদন বরফুকনকে বলে—"আগরওয়ালাকে রাতের বেলা জেনা-রেটারটা একটু বেশী সময় চালু রাখতে বলেছো তো?"

বরফুকন জানায় যে সে বলেছে।

আগরওয়ালা সি. পি. ডবলু. ডি-র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। পাশিঘাটের ভালো জেনারেটারটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। দ্বিতীয় জেনারেটারটার শক্তি কম। তাতে আবার কয়েকদিন যাবৎ ভীষণ ট্রাবল দিচ্ছে। আগরওয়ালা জেনারেটার দুটোর ওপর সন্তান-স্নেহ অর্পণ করেছে। ধুয়ে-মুছে, তেলে-জলে স্নান করিয়ে ওদের সচল রেখেছে। রাতদিন সে ও দুটোর পেছনে লেগেই রয়েছে।

আজ রাতের পার্টিতে ডি. সি. আসবে। একটু নাচগানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আগরওয়ালা জেনারেটারটা বেশীক্ষণ চালু রাখতে প্রথমে রাজী হয়নি। পাশিঘাটে আটটার ভেতর আলো [illegible]। পথেঘাটে আলোর বালাই নেই। বেশীর ভাগ বাড়ি-

ঘর ও সুবিধে থেকে বঞ্চিত। আটটার পনেরো মিনিট আগে আলো নেভাবার সঙ্কেত ধ্বনি দেওয়া হয়। লোকজন হ্যারিকেন আর মোমবাতি নিয়ে প্রস্তুত হয়।—আটটার পর পাশিঘাট অন্ধকারের অতল তলে ডুবে যায়।

আগরওয়ালা তার দুর্বল জেনারেটারটা নিয়ে রিস্ক নিতে চায় না। একটি দুর্বল জেনারেটার মাত্র সম্বল। অপরটি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু বরফুকন নাছোড়বান্দা। রাত এগারোটা পর্যন্ত আলো তাদের চাই-ই। অনেক বলে-কয়ে আগরওয়ালাকে রাজী করিয়েছে। অবশ্য একটা শর্ত রয়েছে। আগরওয়ালাকে মিস্ মজুমদারের সঙ্গে নাচতে দিতে হবে। আগরওয়ালা ড্রিঙ্কস্ চায় না। সাদা চোখেই সে নাচবে। মিস্ মজুমদার যতো ইচ্ছে পান করুক। আগরওয়ালার আপত্তি নেই। বরফুকন আজকের পার্টিতে মিস্ মজুমদারকে পার্টনার বেছেছিলো। তাস খেলার সময় পার্টনার। নাচের পার্টনার। আগরওয়ালা জিদ্ ধরে সব ভেস্তে দিলো। যাক্ গে। আজকের জন্যে আগরওয়ালার এ অনুরোধ মেনে নিতেই হবে।

অন্য সময় হলে আগরওয়ালার এ আবদার সে কখনোই সহ্য করতো না। কিন্তু আজ উপায় নেই। রাজী তাকে হতেই হবে। ডি. সি. আজ রাত্তিরে প্রধান অতিথি। আলো না হলে কি চলে। আর কন্-ফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট লেখার সময় এসে গেছে। ডি, সি-র কাছ থেকে ভালো একটা রিপোর্ট নিয়ে শিলং-এ বদলি হতেই হবে। সমস্ত ব্যবস্থার ভার বরফুকনের ওপর। আজ রাতে জোড়ায় জোড়ায় ওরা নাচবে। চলবে ওয়েস্টার্ন মিউজিক্ রেকর্ডস্। ড্রিঙ্কস্। আর সঙ্গে ভালো খাবার। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলবে। আজ পাশিঘাটের রাতটা হয়ে উঠবে জমজমাট। নেফা ধন্য হবে। ধন্য হবে পাশিঘাট আর তার আশেপাশের অঞ্চল।

—"সইকিয়া এখনো এলো না কেন ?" প্রশ্ন করে দাস।

—"বললে তো সাতটার ভেতর এসে যাবে।" জবাব দেয় সেনগুপ্ত।

—“ওর পার্টিতে জয়েন্ করা সম্বন্ধে আমার ডাউট্ রয়েছে।” বলে মদন।

—“লোকটা যেরকম কর্তব্যপরায়ণ আর কাজ নিয়ে যেরকম সারাক্ষণ মেতে থাকে, কিছু বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত কর্তব্যের খাতিরে কোথাও না বেরিয়ে পড়ে।” বলে বরফুকন।

—“ওর মিসেস্ না এলে কিন্তু আমরা খুব দুঃখিত হবো।” বলে দাস। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কোঁচকায় মিসেস্ দাস।

—“লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের, তাই না?” বলে মিসেস্ মদন।

—“সত্যিই তাই। ডয়ইং গোবিণ্ড-এর হলটা ছেড়ে দিতে কিরকম গড়িমসি করছে। চিত্রাঙ্গদা আর স্বপন কুঁয়োরের রিহার্সেল বন্ধ।” বলে দাস।

—“আচ্ছা, বিশ্বনাথ নন্দীর সঙ্গে শুনছি মিসেস্ ভট্টাচার্যের ভীষণ রেষারেষি চলেছে!” বলে মিসেস্ সেনগুপ্ত।

—“তা তো চলেছেই।” জবাব দেয় মিসেস্ দাস।

—“বিশ্বনাথ নন্দী চায় এবার ‘শাহজাহান’ নাটক মঞ্চস্থ করা হোক। মিসেস্ ভট্টাচার্যের চিত্রাঙ্গদা নাটকের ওপর ঝোঁক। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব আর বচসা।” বলে সেনগুপ্ত।

—“শাহজাহান নাটকে রূপ দেবার মতো লোকজন পাশিঘাটে কোথায়?” বলে দাস।

—“নন্দী সে কথা শুনতে চায় না। সে নাছোড়বান্দা। এর আগে কলকাতায় আর তিনস্থকিয়ায় শাহজাহানের রোলে নেমে সে নাকি দুবার গোল্ড মেডেল পেয়েছে। তৃতীয়বার শাহজাহানের রোলে নেমে সে পাশিঘাটের জনসাধারণকে মুগ্ধ করে দিতে চায়।” বলে বরফুকন।

—“ওই চেহারা নিয়ে শাহজাহানের রোলে?” হেসে গড়িয়ে পড়ে মিসেস্ দাস।

—“শাহজাহানের দুর্ভাগ্য! ভারত-ঈশ্বর শাহজাহান!” বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে মিঃ সেনগুপ্ত।

—"হাসপাতালে গিয়ে দেখবেন, বিশ্বনাথ নন্দী রোগীর মুখের দিকে তাকায় না, এক কোণে মাথা নীচু করে বসে রোগবর্ণনা শুনছে আর ওষুধ লিখে যাচ্ছে। ট্রাইবস্‌দের লোকদের সে দ্বিতীয়বার কথা বলবার সুযোগ দিতে নারাজ। শাহজাহানের রোলে নামতে গেলে যে সব বুলি আওড়াতে হবে তারই মহড়া ঘন ঘন দিয়ে যাচ্ছে। নাটকের লাইনগুলো অনবরত আওড়িয়ে যাচ্ছে।" বলে সেনগুপ্ত।

—"সে কি মশাই ?" মদন বলে।

—"আমার কথা বিশ্বাস না হয় রোগী হয়ে ওর কাছে চলে যান। দাঁড়িয়ে থাকুন ওর টেবিলের কাছে। খানিবক্ষণ পরে শুনতে পাবেন ভারত-ঈশ্বর শাহজাহান বা তচিত করছে। তবে দিল্লীর সিংহাসনে বসে নয়, হাসপাতালের চেয়ারে বসে।" হা-হা করে হেসে ওঠে সেনগুপ্ত।

সইকিয়া তার স্ত্রীকে নিয়ে সেনগুপ্তর বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলো। উদ্দেশ্য পার্টিতে যোগ দেওয়া। পাশিঘাটের শ্মশানের কাছাকাছি তারা এসে গিয়েছিলো। এমন সময় একটা লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়, কি যেন সব ফিস্‌ ফিস্‌ করে সইকিয়ার কানে বলে। সব শোনামাত্র সইকিয়ার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গের আর্দালিকে বলে মিসেস্‌কে সেনগুপ্তর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে। নিজে রওনা দেয় তার নিজের বাংলোর পথে। সিয়াং-এর ধারেই তার বাংলো। ড্রয়ার থেকে লোডেড্‌ রিভলবারটা নিতে হবে। তারপর লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। এখুনি। এই মুহূর্তে।

সইকিয়া পাশিঘাটে এ. পি. ও. টু—মানে পলিটিক্যাল অফিসার নাম্বার টু।

সইকিয়ার কিন্তু পার্টি আর নাচগানের দিকে বিশেষ নজর নেই। খানিকটা নজর দেওয়া শুধুমাত্র তার স্ত্রীর অনুরোধে। সইকিয়ার মাথায় সর্বক্ষণ ঘুরছে ট্যুর। টি. এ। ডি. এ। ট্রান্স্‌ফার, ইনক্রিমেণ্ট, প্রমোশান, এ. পি. ও. টু থেকে এ. পি ও. ওয়ান হবার স্বপ্ন দেখছে সে।

কালে কালে ডাইরেক্টরেটে সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়া। মেমোরে-ণ্ডাম, সার্কুলার, ফাইল, চিঠি, ওয়ার্নিং, হুজুর, হাজির। নেফার অরণ্যকে সে লাল ফিতে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চায়। পাশিঘাটে জেল নেই। সইকিয়া সামান্যতম অপরাধে আসামীকে কোয়ার্টার গার্ডসে পুরে দেয়। যে লোক বিনা অনুমতিতে এয়ার-ফিলডের মাঠে ঘাস কেটেছে, যে রাতের বেলা পাশিঘাটের পথে গরু-ভেড়া ছেড়েছে, তাদের সে ছোট্ট ঘরটিতে অম্লান বদনে পুরে দেয়। সইকিয়া সি. আর পি. অর্থাৎ সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিসের কমাণ্ডারের সঙ্গে ঝগড়া করে। নোট লেখে, তাকে শাসায়। মেডিক্যালের ডাক্তার পরিবারের কেউ নেফায় আসতে চাইলে, পাশিঘাটে বেশীদিন থাকতে চাইলে, ইনার লাইনের পাস নিয়ে সে গড়ি-মসি করে। টালবাহানা করে। পজিসন্ প্রেসটিজ রাখবার জন্যে সময় নেয়। কেরোসিনের দাম দু'পয়সা বাড়ালে সে কোয়ার্টার গার্ডসে পুরবার ভয় দেখায়। তার রক্তচক্ষুকে সবাই ভয় পায়। সে বোট চালিয়ে চলে যায় অনেক দূর। সেই ব্রহ্মপুত্র আর সিয়াং যেখানে মিশেছে প্রায় সেই পর্যন্ত। সেখানে বোট থেকে আফিং চোরাইকারবারিদের নৌকোর ওপর সে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রতিপক্ষকে সে নাস্তা-নাবুদ করে ছাড়ে। বোলানের জঙ্গলে ইঞ্জিনীয়াররা সড়ক ঠিকঠাক বানাচ্ছে কিনা সে-বিষয়ে সে খোঁজখবর নেয়। পাশিঘাটে বিনা পাশে যে প্রবেশ করেছে তাকে সে খুঁজে বার করে। জঙ্গলের পথে কতটা চিনি আর চাল পাচার হচ্ছে, সে খোঁজখবরও তাকে রাখতে হয়। ভীষণ কঠিন সমস্ত কাজ। কিন্তু সইকিয়া তাতে ঘাবড়ায় না। এজন্যেই বোধ হয় তার হাসি, ঠাট্টা, নাচ, গান ভালো লাগে না। এসব কাজ করতে গেলে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিপদও অনেক রয়েছে। সইকিয়ার অফিসের ড্রয়ারে তাই থাকে লোডেড্ রিভলবার। অফিসে এবং বাড়িতে সে সবসময় প্রস্তুত। একবার সইকিয়া বিষাক্ত তীরে জখম হয়ে ডিব্রুগড় হাসপাতালে বেশ কয়েক মাস শুয়ে-ছিলো। অল্পের জন্যে বেঁচেছে। সইকিয়া পান খায় না। সিগারেট

টানে না। ড্রিঙ্কসের ওপর তার আসক্তি নেই। মেয়েমানুষ থেকে সে দূরে থাকে। অফিসার হবার সমস্ত গুণ তার রয়েছে। যেভাবে হোক তাকে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে হবে। শুধু অফিসে নয়, সমস্ত পাশিঘাটে ডিসিপ্লিন চালু রাখার দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে সরকার তাকে পাশিঘাটে পাঠিয়েছে। তার ঘরের পাঙ্খাপুলার পাখা টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ঘরে তাকে দুদিন আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। প্রমোশান তাকে যে কোন প্রকারে হোক পেতেই হবে। নাহলে সম্মান থাকে না। এইমাত্র সঙ্গের লোকটা ফিস্ ফিস্ করে অনেক কিছু বললে। সে গুপ্ত সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় খবর দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ফেলে সইকিয়া গুপ্তর সন্ধানে চলেছে। গুপ্ত ছিলো পাশিঘাটের ওয়ারলেস্ অপারেটার। ঘোর বর্ষায় পাশিঘাটের সঙ্গে যখন বাইরের জগতের সমস্ত সম্বন্ধ বিছিন্ন হয়ে যায়, তখন গুপ্তকে প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। গুপ্তর টেবিল নানারকম মেসেজে ভরে ওঠে। ওয়ারলেসে সমস্ত যোগাযোগ বজায় রাখতে হয়। সব খবরবার্তা পাঠাতে হয়। গুপ্তর তখন অনেক কাজ। অনেক রকম খবরই তাকে পাঠাতে হয়। কিন্তু গুপ্ত সর্বদাই মদে চুর হয়ে থাকে। তার টেবিলে মেসেজ জমে স্তূপ হয়। গুপ্ত সর্বক্ষণ রাম নয়তো আপঙ্ গিলছে। আর ওসব গিলে চলে যায় হুঁশ তার খেয়ালের বাইরে। সময়মতো খবর আসা-যাওয়া করে না। আর এখানেই সইকিয়ার আপত্তি। এজন্যেই সে গুপ্তর ওপর চটে আছে। একটা ভীষণ জরুরী খবর পাঠাতে গুপ্ত দেরি করেছিলো। ডি. সি.-কে বলে সইকিয়া গুপ্তর বদলির অর্ডার বের করেছিলো। উত্তর সিয়াং-এর অভ্যন্তরে এক ভীষণ নির্জন পোস্টে তার বদলির অর্ডার হয়েছিলো। গুপ্ত যায়নি, গুপ্ত অর্ডার রিসিভ পর্যন্ত করেনি। একটা পাহাড়ের উপর গুপ্তর অফিস, চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। সইকিয়া শুনেছিলো গুপ্ত অফিসে রাতদিন কাটায়। শোয়, খায়। রান্নাবান্না পর্যন্ত অফিসের ভেতর। গভর্নমেণ্ট কনডাক্ট রুলসে এসব গুরুতর অপরাধ। দোষীকে শাস্তি দিতেই হবে। সইকিয়াকে

ঘন ঘন সার্কুলার ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু সার্কুলার রিসিভ করবার লোক নেই। পাহাড়ের ওপর ছোট্ট এইটুকুন টেলিগ্রাফ অফিস। দেড়খানা ঘর। পায়রার খুপরির মতো ঘরগুলো। গুপ্ত ঘর থেকে সদাসর্বদা নজর রাখে। টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে ডি. সি-র অফিসের পিওন বা আর্দালিকে এগুতে দেখলেই সে পাহাড়ী পথে নেমে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে খুঁজে বের করা তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে। পিয়ন সার্কুলার দোরগোড়ায় ঝুলিয়ে রেখে বিদায় নেয়। সার্কুলার আর নোট জমতে থাকে। গুপ্ত জঙ্গল থেকে ফিরবার সময় লতাপাতা আর শাকসব্জি নিয়ে ফেরে। সেসব অফিসের ঘরে, অফিসেরই হিটারে, অফিসের ইলেক্ট্রিসিটি খরচ করে সেদ্ধ করে খায়। সরকারের সম্পত্তি নিজের কাজে লাগানো এক গুরুতর অপরাধ। শোনা যায় সে নাকি একটা দুরবীন কিনেছিলো। দুরবীন চোখে লাগিয়ে সে পাহাড়ের ওপর থেকে সব কিছুর ওপর নজর রাখতো। সইকিয়া পাতার পর পাতা নোট লিখে গুপ্তর বিরুদ্ধে কেস ভালো ভাবেই সাজিয়েছিলো। অনেক তথ্য। অনেক প্রমাণ। শিলং ডাইরেক্টরেট থেকে তদারক করবার জন্যে দুজন উপরওয়ালা এসেছিলো। এনকোয়ারি কমিটির সভ্যরা সময়মত সমবেত হলো। কিন্তু সইকিয়া নোট, মেমোরেণ্ডাম, সার্কুলার আর ইস্তাহার কোনো কিছুই হাজির করতে পারলো না। অফিস ড্রয়ার থেকে সমস্ত কিছু নিখোঁজ। বেইজ্জতির চূড়ান্ত। সইকিয়ার মাথা হেঁট। সভ্যরা বিরক্ত। সারা অফিসে গুঞ্জন, হাসি, ঠাট্টা, মস্করা। সব গুপ্তর কাজ। এনকোয়ারি কমিটি বসবার আগের রাত্তিরে গুপ্ত অফিসঘরে ঢুকে ড্রয়ার খুলে সব কাগজপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কেউ টের পায়নি। গুপ্তর জয়। সইকিয়ার পরাজয়। কঠিন মন্তব্য করে মেম্বাররা বিদায় নিলে। সইকিয়ার অপমানের চূড়ান্ত। সেবার সইকিয়া খুব নাকাল হয়েছিলো। সইকিয়া প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে এ অপমানের প্রতিশোধ সে নেবেই। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে করেই হোক গুপ্তকে পাশিঘাট থেকে সরাতেই হবে। গুপ্ত

পাশিঘাটে গা ঢাকা দিয়ে আছে। বেশ কয়েকদিন হলো তার পাশিঘাটে থাকার ছাড়পত্রের মেয়াদ ফুড়িয়ে গেছে। আর ছাড়পত্র ছাড়া পাশিঘাটে থাকা মানেই অপরাধ। আর সে অপরাধ আইনের চোখে দণ্ডনীয়।

রিভলবার পকেটে ফেলে সইকিয়া বেরিয়ে পড়ে। শ্মশানকে পেছনে রেখে, পাওয়ার হাউস ছাড়িয়ে, বাজারের পথ পেরিয়ে, নেপালী বস্তীর উদ্দেশ্যে সে চলতে থাকে। গুপ্ত আজ কয়েকদিন ওখানেই গা ঢাকা দিয়ে আছে। বেশী রাত না হলে ওখানে তাকে পাওয়া যাবে না। পথটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বুনো জানোয়ারের উৎপাত খুব বেশী। সইকিয়ার ভ্রূক্ষেপ নেই। পায়ের ওপর দিয়ে কি যেন সড়সড় করে চলে গেলো। টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেলো একটা কালকেউটে। সঙ্গের লোকটা খুব ভয় পেয়েছে। সইকিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ওধারটায় ফেলতেই দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। লেপার্ড হবে হয়তো। বড্ডো হিংস্র। সইকিয়া রিভলবারের বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরে। এখন গুলি করা চলবে না। গুপ্ত গুলির শব্দ পেলে আর আলো দেখলে অদৃশ্য হবে। এত মেহনত মাঠে মারা যাবে। সইকিয়া সঙ্গের লোকটাকে ধরে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলে। টর্চটা পর্যন্ত সে জ্বালেনি পাছে গুপ্ত টের পায় তার আগমনবার্তা। নেপালী মেয়েটার ঘরে প্রায় সারারাত তাকে ওর সঙ্গে থাকতে হয়েছে। অভিনয় করতে হয়েছে। প্রেমের জয়গান গাইতে হয়েছে। বার বার মদের গ্লাস হাতে তুলে নিতে হয়েছে। মদ সে খায়নি। দু'এক ঢোকের পর মেয়েটির অজ্ঞাতে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। রাত আড়াইটের সময় গুপ্তর স্টেজে আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে সইকিয়া তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গুপ্ত ভোজালি তুলেছিলো বুকে বসাবার জন্যে। রিভলবারের কঠিন শীতল নল তার বুকের পাঁজরে ঠেকাতেই গুপ্ত ভোজালি নামিয়ে নিয়েছে। রাত তিনটের সময় ওকে নিয়ে সইকিয়া অফিসে ফিরেছিলো।

গুপ্তর হাতে হাতকড়া লাগানো। গুপ্ত এতোটা আশা করেনি। মাথা তার হেঁট হয়েছে। দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। সে-রাতেই সইকিয়া ডি. সি-র কাছে খবর পাঠিয়েছিলো। ডি. সি তখন সেনগুপ্তের বাড়িতে মিসেস্ সইকিয়ার সঙ্গে নাচছে। পার্টি তখনো ভাঙ্গেনি। দুজনের কেউই সইকিয়ার এ খবরটা খুব খুশিমনে নেয়নি। পার্টির সমস্ত আবহাওয়াটা যেন কেমন নষ্ট হয়ে যায়। বিষিয়ে ওঠে ডি. সি-র মনটা। এ খবরটা সইকিয়া পরের দিন অফিসে দিলেই পারতো।

দশটায় অফিসে এসে সে সইকিয়াকে ডেকে পাঠায়।—"আমি শিলং ডাইরেক্টরেটে আজই আপনার প্রমোশানের ব্যাপারে লিখছি।" তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বলে—"মিনু এতো ভালো নাচে এটা আমার আগে জানা ছিলো না।"

মিনু হলো মিসেস্ সইকিয়া। উন্নতির মইটা বেয়ে সইকিয়া ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। তাকে উঠতেই হবে। না হলে শান্তি নেই। এখনো অনেকগুলো সোপান তাকে অতিক্রম করতে হবে। ডয়ইং গোবিং মানে পাশিঘাটের ক্লাব-ঘরে সেদিন সন্ধ্যায় সে ফুংফাংকে শাসন করে। ফুংফাং জাতিতে লুসাই। সইকিয়ার দক্ষিণহস্ত। কিন্তু সইকিয়ার কাছে কারো নিস্তার নেই। ফুংফাং-এর জীপে লোকের সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী ছিলো। তাছাড়া নির্ধারিত স্পীডের ওপরে স্পীড দিয়ে ফুংফাং জীপ চালিয়েছিলো। ফুংফাংকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে সইকিয়া বেরিয়ে পড়ে। আড্ডা দিতে সে এখানে আসেনি।

॥ দশ ॥

পাশিঘাটে রয়েছে মিস্টার ভট্টাচার্য আর তার স্ত্রী। ভট্টাচার্য পাশিঘাটের ফরেস্ট অফিসার। জঙ্গলভর্তি গাছ। লতা, কুঁড়ি, পাতা, ফুল আর ফল। পুরানো গাছ মরে। পাতা ঝরে। নতুন গাছ জন্মায়। কুঁড়ি থেকে ফুল। ফুল থেকে ফল। ফল পাকে। ঝরে যায়। জঙ্গলে কতো ধরনের জীবজন্তু রয়েছে। সংখ্যায় তারা অসংখ্য। কে তার হিসাব রাখে। হিসেবপত্র রয়েছে সব ফাইলে। লাল ফিতে দিয়ে সে সমস্ত ফাইল বাঁধা। সমস্ত কিছু স্ট্যাটিস্টিকদের সংখ্যার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। ফাইল খুলে ভট্টাচার্য মুহূর্তে সব কিছু বলে দিতে পারে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা তার পোষায় না। জীবজন্তুরা নেফার জঙ্গলে বেঁচে থাক। বেঁচে থাক স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে। সুখে ঘর-সংসার করুক। গাছপালা দীর্ঘজীবী হোক। বংশবৃদ্ধি করুক। অফিসে কেরানীরা ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে তর্কের তুফান বইয়ে দিক। ঘুষ আর টাকাপয়সা নিয়ে বাদানুবাদ, বচসা হোক। হাতীর-দাঁত, লেপার্ড স্কিন, হরিণ আর অজগরের চামড়ার হিসেবনিকেশ নিয়ে ওরা মাথা ঘামাক। ভট্টাচার্যের কোনো আপত্তি নেই। সে অফিস বস্। ব্যস ওই পর্যন্ত। ভট্টাচার্য আর তার স্ত্রী ব্যস্ত গানবাজনা নিয়ে। ভট্টাচার্য যদি ঠুংরির কায়দাকানুন রপ্ত করতে ব্যস্ত থাকে, মিসেস্ তবে রবীন্দ্রসংগীতের সুরে গুন্‌গুন্ করে গাইতে থাকে। ভট্টাচার্য তবলা বাজায়। হরেক-রকম তাল নিয়ে উতলা হয়ে ওঠে। ঝাঁপতাল, তিনতাল, একতাল। ঝুমরা, আড়া, চৌতাল আর তিলুয়ারা। সারাদিন ধরে চলে মেহনত। পাড়াপ্রতিবেশীদের কানে তালা লেগে যায়। তবলার ঝাঁপতাল আর তিনতালের কসরৎ চলতে থাকে ঘন ঘন। ধিনা ধি ধিনা। তিনা ধি ধিনা। আবার ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা। তিন্ তিন্ তা। তা ধিন্ ধিন্ ধা। ওদিকে মিসেস্ ব্যস্ত সেতার নিয়ে। মিড়, গমক, মূর্ছনায় ডুবে থাকে। আলাপ জোর ঝালায়, মাতিয়ে তোলে চারদিক। মোট কথা সঙ্গীত নিয়ে দুজনেই মেতে আছে। কথক,

মণিপুরী, ভারতনাট্যম ছেলেমেয়েদের শেখাবার জন্যে ওরা মেননকে দিল্লী থেকে নিয়ে এসেছে। মেনন পলিটিক্যাল অফিস থেকে একটা মাইনে পায়। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ভট্টাচার্যদের বাড়িতে। বরফুকন শঙ্করদেব আর মাধবদেবের বরগীত শেখায়। মেনন নাচ শেখায়। বিহুগীত শেখায় মিসেস্ সইকিয়া। আদিদের চলোং পুনু উৎসবের সব কিছু শেখাবার ভার ওরাং বাটুর মেয়ে নিয়েছে। মিসেস্ ভট্টাচার্য এক মিনিটও চুপ করে থাকতে পারে না। তার মুখ দিয়ে অনবরত খই ফোটে। মিসেস্ ভট্টাচার্যের বাড়িতে সবাই জড়ো হয়। নাচগানে পাড়া মেতে ওঠে। মিসেস্ কাউকে গরম হালুয়া খাওয়াচ্ছে। কাউকে গলায় সেঁক দিয়ে দিচ্ছে। হাসপাতালের মেল আর ফিমেল নার্সরা মিলে একটা ফাংশন করছে। মিসেস্ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সেদিন ডয়ইং গোবিঙ-এ রিহার্সেল চলেছে। অসমীয়া উৎসব বহাগ বিহুর রিহার্সেল।

বাইরে এপ্রিলের সূর্য। প্রখর আর কঠিন। তপ্ত মাটি। তপ্ত জমি। সেই মাটি বর্ষার জলে ভিজবে। শস্য বোনা হবে। ফলবে ফসল। বিহু নাচ যৌবনের প্রবল আকর্ষণ।

শুধু যৌবনের জয়জয়কার। তোমার যৌবন আছে। আমার যৌবন আছে। আমাদের মিলনে হবে সার্থক সৃষ্টি। সূর্যের প্রখর তাপে জমি তেতে ফেটে আছে। বর্ষার স্নিগ্ধধারায় তাকে করে তুলবে সম্ভাবিত। হবে সুজলা আর সুফলা।

কিশোরীর বুকের লাল রিহাতে জানাচ্ছে আগামী দিনের সম্ভাবনা। আমি নাচছি, নেচে চলেছি। আমাকে এখন ডেকো না। তোমার ডাক যে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে। আমার যে বিহু নাচ নাচা হবে না। ঢোলের সঙ্গে সঙ্গে কি উন্মাদনা। কি আকর্ষণ! সঙ্গে বাজছে মোষের শিং-এর তৈরী সিঙ্গা। নাচের সঙ্গে সঙ্গে ফুকন গানের মর্ম বুঝিয়ে যাচ্ছে।

—"জানেন ফুকন সাহেব, স্টেজের পরদা বদলাতে চেয়েছিলাম, পলিটিক্যাল অফিস পয়সা দিলে না। ওরা যে পয়সা গ্র্যাণ্ট করেছে

তাতে সমস্ত কিছুর জন্যে খরচ করে পরদা কেনা যায় না। ওরা ভাবে পয়সা বাঁচিয়ে আমরা পেট ভরাবো।" বলে মিস্টার ভট্টাচার্য।

—"সইকিয়া এসবের মর্ম কি বুঝবে। সে আর্ট বোঝে না। সে শুধু বোঝে চালডালের হিসেব। বোঝে সি আর. পি. (সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস), বি. এম. পি. (বিহার মিলিটারী পুলিস), চুরি আর খুনজখম। ট্রাইবস্‌দের সে রক্তচক্ষু নিয়ে শাসাতেই শিখেছে। মেননকে অকারণ কতোগুলো কড়া কথা শুনিয়েছে। মেনন বোনের অসুখের ছুতো করে ডি. সি-র কাছ থেকে পাস যোগাড় করে পাশিঘাট ছেড়েছে। বোধ হয় পাশিঘাটে আর ফিরবে না। ছেলেমেয়েদের নাচ কে শেখাবে বলুন দেখি!" এতো জোরে মিসেস্ ভট্টাচার্য কথাগুলো বলে যে মনে হয় কানের পরদা বুঝি ফেটেই যাবে। কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে মিসেস্ ভট্টাচার্য। চোখ দুটো শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঘন ঘন মুছতে থাকে।—"কদিন থেকে চোখটা বড্ডো জ্বালাচ্ছে। জল পড়ছে ঘন ঘন। ডিব্রুগড় কি গৌহাটি গিয়ে চশমা নিতে হবে।" বলে মিসেস্ ভট্টাচার্য।

—"আমি এ. পি. ও. টু-এর জারিজুরি সব ভাঙ্গবো। কালকে ডি. সি-র অফিসে গিয়ে বেশ কড়া দু'কথা শুনিয়ে আসবো।" বলে মিসেস্ ভট্টাচার্য।

ওকে সবাই ভয় পায়। অনেক বাড়ির হাঁড়ির খবর সে রাখে। কথায় কথায় ঝগড়া করে মিসেস্ ভট্টাচার্য। কালকে ডি. সি-র অফিসে গিয়ে মিসেস্ ভট্টাচার্য সত্যি হয়তো একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। মিস্টার ভট্টাচার্য চিন্তিত হয়ে পড়ে বৈকি। বলা যায় না। ডি. সি চটে গিয়ে যদি তাকে আবার নেফার অভ্যন্তরে কোথাও বদলি করে দেয়! আদি নার্সরা চলোং পন্নু থেকে খানিকটা প্রেজেণ্ট করবে। নিলাম ডাই আর মাহুট্ জামু সব কিছু শেখাচ্ছে। গালং ছেলেরা আর মিনিয়ঙ মেয়েরা এসেছে পন্নুং নাচতে। নাচের সঙ্গে চলবে সমবেত সঙ্গীত। একটানা সুরে সবাই গেয়ে যাবে। সবাইকার হাতে থাকবে

একটা ভোঁতা তরবারি। তরবারির গোড়ার দিকে কয়েকটা লোহার থালা। তরবারি নাচালে তাতে শব্দের সৃষ্টি হয়। বিষয়বস্তু হলো আদিদের পুরানো ঐতিহ্য, তাদের ইতিহাস।

এক ফাঁকে মিসেস্ ভট্টাচার্য স্টেজ থেকে নেমে হলের বাইরে চলে এসেছে। ঝোপজঙ্গল যেখানে খুব ঘন সেখানে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলের গিঁট খুলে একটুকরো কাগজ বের করেছে। কাগজের টুকরোটা সে আলোয় মেলে ধরেছে। কয়েকটা লাইন তাতে লেখা রয়েছে।

মেনন লিখেছে—"তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আমি জানি তুমিও আমাকে ভালোবাস। তাই চেয়েছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। তুমি রাজী হলে না। ভয় পেলে। আমার পক্ষে পাশিঘাটে থাকা আর সম্ভব হলো না।"

কয়েকটা লাইন। মিসেস্ ভট্টাচার্য চিন্তামগ্ন। টের পায়নি যে আমি পেছন থেকে সব কিছু দেখেছি।

ছোট্ট চিঠিখানার ওপর মিসেস্ ভট্টাচার্যের দশবার চোখ বুলিয়েও আর যেন আশা মেটে না। এর পর কাগজখানা সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জমির ওপর ছড়িয়ে দেয়। পাতা ঝরে যায়, পুরানো গাছ মরে। নূতন গাছ জন্মায়। কুঁড়ি থেকে ফুল। ফুল থেকে ফল। ফল পাকে। ঝরে যায়। তার বীজ থেকে নূতন অঙ্কুর উঁকি দেয়। নূতন সম্ভাবনা। মিসেস্ ভট্টাচার্য এখন শুধু সম্ভাবনা নিয়ে বেঁচে থাকবে। হয়তো আবার ওর সঙ্গে কোথাও কোনোখানে দেখা হবে। সেই আশা নিয়েই বাঁচবে।

মেমনকে আমি শিলং-এর হোটেলে মিট্ করেছিলাম। একঘরে দুজনে কিছুদিন থেকেছি। অন্তরঙ্গতা হয়েছিলো। মেনন আমাকে সব খুলে বলেছিলো। ও চিঠিতে কি লিখেছিলো তা পর্যন্ত বলেছিলো।

॥ এগার ॥

কাম্বুর ইন্‌স্‌পেক্‌শন্‌ বাংলোতে বসে কথা হচ্ছিলো সার্কেল অফিসার তরফদারের সঙ্গে। তরফদার একটার পর একটা সিগারেট শেষ করে যাচ্ছিলো। আর শোনাচ্ছিলো নেফা কাহিনী। পাশে বসেছিলো মিসেস্‌ তরফদার। তরফদার পরিবারের সঙ্গে পাশিঘাটে আলাপ। তরফদার পাশিঘাটের পর নেফার অনেক স্থান ঘুরে সম্প্রতি কাম্বুতে বদলি হয়েছে। ওরা স্বামী-স্ত্রীতে কাম্বু পরিদর্শন করবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কাম্বুতে আসা। নেফাতে সিয়াং ডিভিসানের প্রধান শহর আলং। আলং ছাড়িয়ে উত্তরে টুটিং, গেলিং, টাবাসোরা আর কাম্বু। তারপর যে সমস্ত জমি রয়েছে তার অনেক স্থানের জরিপ হয়নি। অনেক স্থানে সভ্য জগতের মানুষের পা পড়েছে কিনা সন্দেহ। পাহাড় আর পাহাড়। দশ-বারো হাজার ফিটের ওপরে সব পাহাড়। পাহাড়ী নদীগুলো উন্মত্ত, উদ্দাম। সিয়ম, সিমেন, সিবু, সিডো। আরো কতো নদী রয়েছে। তরফদার সিয়ম, সিমেন আর সিবুর তীরে তীরে জরিপ করে বেড়ায়। অর্কিডের সন্ধান করে। তিব্বত থেকে সেসময় প্রচুর আফিং-এর চোরাই চালান চলছিলো। সেসব বন্ধ করারও চেষ্টা করছিলো আমাদের তরফদার। তরফদারের প্রচুর সাহস। অদম্য উৎসাহ। আজ চৌদ্দ বছর ধরে তরফদার নেফা সার্ভিসে রয়েছে। অনেক সাহস সঞ্চয় করে, অনেক আশায় বুক বেঁধে, পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে, দুর্দান্ত এ্যাডভেঞ্চারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে ঢুকেছিলো নেফা সার্ভিসে। নেফাতে ঘুরতে ঘুরতে আজ সে ক্লান্ত, শ্রান্ত। তরফদার কামেং ডিভিসানের বুড়াগাঁও আর বম্‌ডিলাতে ছিলো। বম্‌ডিলা ন হাজার ফিট উঁচু। তারপর টোয়াং। টোয়াং-এর কাছাকাছি অঞ্চলের বরফের ওপর তরফদার বিরাট বিরাট সব পায়ের ছাপ দেখেছিলো। সেখানে নহা ডাকবাংলোর বারান্দার জানালায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিসেস্‌ তরফদার যে বীভৎস মুখখানা দেখেছিলো সে মুখের মালিকের পায়ের ছাপই কি বরফের

ওপর পড়েছিলো ? একি সেই অনেক আলোচিত তুষারমানব, নাকি এ সাধারণ মানুষের পদচিহ্ন ! বরফ গলে গলে পায়ের ছাপ বৃহদাকার ধারণ করেছিলো। পদচিহ্নের মালিকের খোঁজে অনুসন্ধান চালিয়ে তরফদার তিব্বতের দিকে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু কোনো হদিসই সে করতে পারেনি। মিসেস্ তরফদার সেদিন ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো এবং তারপর থেকেই মিসেসের ওই ফিটের অসুখটা ভালো ভাবে জাঁকিয়ে বসেছে। অল্প ভয় পেলেই মিসেস্ তরফদার ফিট্ হয়। আর ফিট্ হলেই শরীরটা বেঁকে যায়। মুখ দিয়ে ফেনা গড়ায়। তরফদার ওকে কামেং ডিভিসানের টোয়াং মনস্টারির লামার কাছে নিয়ে গিয়েছিলো। লামার নাকি অদ্ভুত সব ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায়নি। তরফদারের অভিজ্ঞতা কতো। চৌদ্দ হাজার ফিট উঁচু সেলা পাস্ সে অতিক্রম করেছে। টোয়াং-এর লাইব্রেরীতে বসে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে সে ধর্মালোচনা করেছে। নিজে সে মন্পাসদের সাজে সজ্জিত হয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শেরডুক পেন্স আর মন্পাসদের সঙ্গে ঘুরেছে। শেরডুক পেন্স আর মন্পাসরা সাত হাজার থেকে সতেরো হাজার ফুট ওপরে বাস করে। কস্তুরী, কম্বল, চামরী গাই-এর লোমের চাদর, কাঠের নানারকম জিনিস আর পাথরের মালা তারা কেনাবেচা করে।

তরফদার কাম্বুর বাংলোতে বসে আমাকে টিরাপের গল্প শুনিয়েছে। কোথায় কামেং আর কোথায় টিরাপ। টিরাপের সীমান্ত ব্রহ্মদেশের সীমান্তের সঙ্গে মিশেছে। তরফদার টিরাপে ছিলো। টিরাপের খোন্সাতে ছিলো। খোন্সা, চ্যাংলাং, লোন্কাও, সেনুয়া, লঙ্ফঙ্। অরণ্য আর অরণ্য। অনুর্বর, ধূসর, দুর্গম সব পাহাড়। টিরাপ অঞ্চলে একসময় হেড হান্টিং, দাসব্যবসা, বাচ্চা-চুরি, আফিং-এর চোরাকারবার প্রভৃতি ছিলো অতি সাধারণ ব্যাপার। এক গ্রাম অতর্কিতে আর এক গ্রামকে আক্রমণ করে কচ্কচ্ করে মাথা কেটে নিয়ে যেতো। যে যতো কাঁচা মাথার অধিকারী গ্রামে তার ততো প্রতাপ। হরিলুটের বাতাসার

মতো কাঁচা মাথার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। ভারত সরকার অনেক চেষ্টা করে মাথা কালেকশানের রেওয়াজটা বন্ধ করেছে। কড়া শাসন চালু করেছে। আইন আদালতের হুমকি দিয়ে সব বন্ধ করবার চেষ্টা করছে। উৎসবের দিনে তাই মাটি দিয়ে তৈরী মানুষের দেহ থেকে মুণ্ডু বিচ্ছিন্ন করার রেওয়াজটা রয়ে গেছে। তারা কাঠ আর মাটি দিয়ে তৈরী মানুষের মাথা গলায় ঝুলিয়ে বেড়ায়। পুরানো দিনের কুসংস্কার দূর হতে সময় নেবে। তরফদার বলে আর মৃদু মৃদু হাসে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমাদের দেশে যেমন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াবার জন্যে বর্গীর ভয় দেখানো হতো তেমনি অনেকদিন আগে অসমীয়া মা বাচ্চা ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বলতো রাংপা আসবে। খোকা ঘুমো। রাংপার দল ব্রহ্ম সীমান্তে পাট্‌কই পাহাড়ের কোণে কোণে বাস করতো। আর সুযোগ পেলেই প্লেন্‌সের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতো।

—"ওখানে কি কি জাত রয়েছে?" আমি প্রশ্ন করি।

—"ওয়াং চু, নক্টাস্‌, ট্যাংসাম্‌, সিংফোস্‌। বছর কয়েক আগে আমার টিরাপে পোস্টিং হয়েছিলো। ছিলাম খোন্‌সাতে। একটা বিরোধের মীমাংসার জন্যে অনেকটা অভ্যন্তরে ঢুকতে হয়েছিলো। সঙ্গে অবশ্য বন্দুকধারী পুলিস ছিলো। ওয়াং চুস্‌ ট্রাইবের লোক নক্টেট্রাইবের কয়েকটা লোকের মাথা কেটে নিয়ে গেছে। কটকী বা দোভাষীর মাধ্যমে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছি।" তরফদার গল্প শোনায়। কাম্বুর বাংলোতে বসে তরফদারের গল্প শুনছিলাম। বসে রয়েছি সিয়াং ডিভিসানের কাম্বুতে। শুনছিলাম কিন্তু টিরাপের কাহিনী।

তরফদার বলে যাচ্ছে—"কটকীর মারফৎ নক্টেট্রাইবের লোকদের জানানো হলো সাক্ষী-সাবুদ যোগাড় করতে। বিচার করতে হবে। ওরা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। পোকা খাওয়া দাঁত বের করে হাসে। বলে এ আবার কি কথা। এতো পরিশ্রম কে করতে যাবে। আর এতো পরিশ্রম করবার সময় কোথায়। তাদের গ্রামে উৎসব রয়েছে। নকল

যুদ্ধের মহড়া দিতে হবে। লোকদের মাথা পাওয়া যায়নি, দেহ তো পাওয়া গেছে। শরীরের জন্যে মুণ্ডুর দরকার, তা মুণ্ডু এনে দিলেই হবে। দুপুরের দিকে তাঁবুর আশেপাশে একটা গোলমাল। ওদের ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। টেবিলের ওপর ঠিক আমার স্টাইলের ওপর সগুকাটা রক্তাক্ত দুটো মাথা ওরা এনে ফেলেছে। সাহেবকে কথা দিয়েছে। ধড়ের জন্য মুণ্ডুর দরকার। ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন মাথা দুটো সাজিয়ে রেখে ক্রমাগত আমাকে সেলাম জানাতে থাকে। বুঝে দেখো আমার অবস্থা।"

—"কি সাংঘাতিক কথা!" বলি আমি।

তরফদার সিগারেট টানছিলো আর গল্প বলে যাচ্ছিলো। বাংলোর বারান্দায় নীচু হয়ে বসে একটা লোক পাখার দড়ি টেনে যাচ্ছিলো। লোকটার কোমর থেকে একফালি কাপড় ঝুলছে। প্রায় নগ্নই বলা চলে। লোকটা হঠাৎ পাখার দড়ি টানা বন্ধ করে। তারপর উঠে এসে তরফ-দারের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে আর কি যেন সব বলে চলে। তরফদার হাত ধরে ওকে টেনে তোলে। ওর ভাষাতে ওকে কি যেন বোঝাতে থাকে। কি যে বুঝিয়েছিলো বলতে পারবো না। তবে লোকটা আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে দড়ি টানতে শুরু করে। লোকটার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। মনে হয় যেন ঝিমোচ্ছে। তরফদারকে লোকটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তরফদার যা বলেছিলো তার সারমর্ম শোনাচ্ছি। লোকটার নাম তোলো কাহু। অনেকদিন অন্যের কাছে থেকেছে। থেকেছে দাস হয়ে। গালংদের দুই ট্রাইবের ভেতর সংঘর্ষের ফলে বেচারা বন্দী হয়। আর বন্দী অবস্থায় ওকে ক্রয়-বিক্রয়ের চৌকাঠ বারকয়েক অতিক্রম করতে হয়েছে। একজন ওকে কিনে কিছুদিন তার কাছে রেখে পরে অন্যের কাছে চড়াদামে বিক্রী করেছে। দাস আখ্যা নিয়ে বেশ কয়েকবার সে হাতবদল হয়েছে। ইয়ামসা, ইয়াকিং, কাম্বু অনেক স্থানে অনেক প্রভুর সেবা তাকে করতে হয়েছে। দুঃখকষ্ট গেছে অনেক। সহ্য করতে হয়েছে অনেক ঝড়ঝাপটা।

সামান্য সামান্য জিনিসের পরিবর্তে হাতবদল হয়েছে। তামার

থালা, ঘটি, বাটি, মিথোন। ঐসব জিনিসের পরিবর্তে এক এক প্রভু তাকে পেয়েছে। পরে বেচে দিয়েছে। সর্বশেষ তরফদার সরকারের তরফ থেকে গিয়ে টাকা দিয়ে তাকে কিনে মুক্তি দিয়েছে। তোলো কাহ্ন এখন স্বাধীন মানুষ। আফিং খাবার অভ্যেসটা অবশ্য ওর এখনো গেলো না। তরফদার অনেক চেষ্টা করেছে যাতে ও আফিং ছেড়ে দেয়। কিছু করতে পারেনি। আফিং খেয়ে ও সারাটা দিন ঝিমোয়। শক্তি-সামর্থ্য বলতে ওর আর কিছু নেই। সব যেতে বসেছে। তোলো কাহ্ন যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, সে মেয়ের ওপর তার অন্য চার ভাই-এর পুরো যৌন অধিকার রয়েছে। বিয়ে করেছে তোলো কাহ্ন।

ভাইদের ঔরসে যেসব ছেলেমেয়ে হয়েছে বা হবে তাদের সমস্ত দায়িত্ব তোলো কাহ্নর। এটাই নিয়ম। আর তোলো কাহ্নর এতে আপত্তিও নেই। আপত্তি শুধু একটি ব্যাপারে। সম্প্রতি তার বউ চার ভাই-এর এক ভাই-এর সঙ্গে বেশীরকম ফষ্টিনষ্টি শুরু করেছে। ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটি দুবার পালিয়েছিলো। অনেক কষ্ট করে তাকে ধরে আনা হয়েছে। তোলো কাহ্ন এসে তরফদারকে ধরেছে। হুজুরের একটা আদেশ হলে মেয়েটা আর পালাতে সাহস পাবে না। তাছাড়া ভাইটাকে যদি সাহেব একটু শায়েস্তা করে। তার বিশ্বাস সাহেব সব পারে। সাহেবের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। তোলো কাহ্ন বউকে নিয়ে পাশিঘাটের কাছাকাছি ছিলো। তখন জিমি দেবতার কাছে মানত করেছে। পিরকু অপদেবতাকে অনেক ডেকেছে। তোলো কাহ্ন সম্বন্ধে তরফদার এক আশ্চর্য কাহিনী শোনালো। তোলো কাহ্ন সিবু নদীর ধারে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলো। কাঠ কাটার সময় ওকে সাপে কাটে। কিছুতেই ওকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। সঙ্গের লোকটা তোলো কাহ্নর মৃতদেহটা জঙ্গলে ফেলে গ্রামের লোকদের খবর দিতে ছোটে। লোকজন সঙ্গে নিয়ে সে যখন ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পায়। যে তোলো বিষে জর্জরিত হয়ে নীলবর্ণ হয়ে মরে পড়েছিলো সেই তোলো কাহ্ন উঠে বসেছে।

তার শরীরে নীল ভাবটা আর তেমন নেই। তার আশেপাশে কয়েক হাজার জোঁক মরে পড়ে আছে। বিষটা বোধ হয় ওরা রক্তের সঙ্গে নিজেদের দেহে টেনে নিয়েছিলো। কাহু প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আর জোঁকেরা দলে দলে মরেছে। বাঁচিয়ে দিয়েছে তোলোকে। তরফদার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলো। রোগীকে সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করে আলং এবং পরে পাশিঘাটের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। তোলো কাহু বেঁচে যায় এবং সেই থেকে সে তরফদারের বিশেষ ভক্ত।

তরফদারের গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ গগনভেদী এক চীৎকার। বাংলোর আশেপাশে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আলো-আঁধারের খেলা চলেছে। তরফদার বিদ্যুৎবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং পরমুহূর্তে দৌড়ায়। পেছনে আমি। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিলো। মিসেস্ তরফদার বাথরুমের পাশে বারান্দায় পড়ে রয়েছে। মিসেস্ তরফদার অজ্ঞান হয়ে গেছে। সেই ফিটের ব্যারাম। মুখ থেকে ফেনা গড়াচ্ছে। তার মুখে-চোখে জল ছিটোবার পর মিসেস্ তরফদার চোখ মেলে তাকায়। মুখে-চোখে কিরকম একটা আতঙ্কের ভাব। মিসেস্ তরফদার ভয় পেয়েছিলো। এবং ভয় পেয়েই অজ্ঞান হয়েছিলো। এখনো সে ভাবটা রয়েছে। সে আঙুল দিয়ে বাথরুমের জানালাটা দেখিয়ে দেয়। তরফদার লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে বাগানের দিকে দৌড়োয়। বাংলোর সঙ্গে বিশাল বাগান। অজস্র গাছপালা। অনেক রকম ফুলের গাছ। তরফদারের পেছন পেছন আমিও এগিয়ে যাই। বাগানের ভেতর তরফদার যাকে পেয়েছিলো তাকে দেখলাম। তরফদার আগে থেকেই চেনে।—"ও তুমি!" বলে তরফদার।

লোকটা কোনো উত্তর দেয় না।

—"বাংলোর দিকে গিয়েছিলে কেন!" প্রশ্ন করে তরফদার।

—"তোমার খোঁজে। তোমাকে পেলাম না। তাই আবার এখানে ফিরে এসেছি।" লোকটা জবাব দেয়।

তরফদার আলাপ করিয়ে দেয়। ওর নাম কারছ টাইপোদিয়া।

তাহলে টাইপোদিয়া বাংলোর বারান্দায় উঠেছিলো। বাথরুমের জানালা থেকে সন্ধ্যের অন্ধকারে মিসেস্ তরফদার ওর মুখই দেখেছিলো। দেখে ভয় পায় এবং ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

কারহু টাইপোদিয়ার ভয় পাওয়ার মতো চেহারাই বটে। লোকটা কেমন পাগলাটে ধরনের। গায়ের রং ফরসা। বিরাট একটা মাথা। মনে হয় একটা ফরসা গরিলার মুখ বসিয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট চোখ। চ্যাপটা নাক। নাকের ওপর একটা রূপালী ফ্রেমের চশমা। মুখে দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই। সামনে দুটো দাঁত নেই। সব চেয়ে মারাত্মক হলো কারহু টাইপোদিয়ার হাসি। হাসির সঙ্গে কেমন যেন একটা বিদ্রূপের ভাব মিশে রয়েছে। আর চোখ দুটো সর্বক্ষণ রক্তবর্ণ।

তরফদার জানায় কারহু এ অঞ্চলের খুব প্রভাবশালী লোক। সে কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা করেছে। কারহু আলং তার পাশিঘাটে কাঠ চালান দেয়। এছাড়া জঙ্গলের ভেতর পাহাড় পর্বত উড়িয়ে দিয়ে সি. পি. ডবলু. ডি.র ইঞ্জিনীয়ারেরা যখন পথঘাট তৈরী করে, কারহু তখন মজহুর যোগাড় করে এনে দেয়। ট্রাইবের লোকদের ওপর কারহুর ভীষণ প্রভাব।

—"ওর একসময় অনেক টাকা ছিলো। এখন তেমন নেই।" বলে তরফদার।

কারহু নীচু হয়ে ততক্ষণে গাছের গুঁড়ি আর আশেপাশের জমি পরখ করছে। আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখছে না। আশেপাশের মাটিতে ঘন ঘন কুড়ুল চালাচ্ছে।

—"এখন টাকা নেই কেন?" প্রশ্ন করি।

—"নেফাতে ব্যাঙ্ক নেই। যে ছোট্ট পোস্ট অফিস রয়েছে তা কাম্বুর অরণ্য থেকে বহুদূরে। দুদিনের পথ। কারহুর পোস্ট অফিসের ওপর খুব বিশ্বাসও ছিলো না। সমস্ত টাকা সে মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিলো। সমস্ত টাকা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলো। লুকিয়ে রেখেছিলো গাছের নীচে, নদীর তীরে, মাটির তলায় আর

পাহাড়ের গুহায়। বিভিন্ন স্থানে টাইপোদিয়া তার অর্থ লুকিয়ে রেখেছিলো।"

—"সেসব টাকা বুঝি খুঁজে পায়নি ?"

—"না। কিছু পেলেও পেতে পারে। বেশীর ভাগই পায়নি। টাইফয়েড রোগে ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেলো। টাকা কোথায় রেখেছিলো সুস্থ হবার পর সব ভুলে বসে রইলো।"

—"তারপর ?" আমি প্রশ্ন করি।

—"সেইজন্যে গুপ্তধনের সন্ধান অনবরত চালিয়ে যাচ্ছে কারহু টাইপোদিয়া। তাই টাইপোদিয়াকে বেশীর ভাগ সময় কুড়ুল হাতে নিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পরীক্ষা করঁতে দেখা যায়। আজকেও এসেছিলো বাংলোর আশেপাশের জমি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। তারপর কি মনে হয়েছে বারান্দায় উঠে পড়েছে আমার সঙ্গে দেখা করবার আশায়। আর ওকে দেখেই শ্রীমতী মূর্ছা গেছে।"

কারহু টাইপোদিয়া নীচু হয়ে একটা গাছের গুঁড়ি পরীক্ষা করছে। কোনো কিছুর সন্ধান পেলো কিনা কে জানে। দু'চারটে লাল পিঁপড়ে টিপে টিপে সে মারছে। কার ওপর আক্রোশ কে জানে। হঠাৎ কি মনে হতে সে ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর সোজা আমাদের দিকে চলে আসে। তরফদার পরিচয় করিয়ে দেয়। নেফাতে ছেলে পড়াতে এসেছি শুনে কারহু টাইপোদিয়া হেসেছিলো। হাসি শুনে আমার অন্তরাত্মা জল হয়ে গিয়েছিলো। মনে হয় একটা গরিলাই যেন হাসছে।

—"কি জানিস নেফার যে ছেলে পড়াতে এসেছিস ? জানিস কিছু ?"

—"তুই" "তুই" করে বলাটা টাইপোদিয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে। স্বীকার করতে হয় কিছুই জানিনে।

—"তোরা সব বিশ্বাসঘাতক। প্লেন্‌সের লোকদের নেফাতে ঢুকতে না দেওয়াই উচিত। আর সে নিয়ম যাতে চালু থাকে সে ব্যবস্থাই আমি করবো। তোরা সব বড্ডো নেমকহারাম। বড়পূজারী তিন-

সুকিয়া থেকে ছুটো সাহেবকে নিয়ে এলো। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্পের আগে আসামের ডিব্রুগড় আর তিনসুকিয়ায় গালংদের যাতায়াত ছিলো। কিরুকে গিয়েছিলাম। কিরুক মানে তোরা যাকে শিকার বলিস তাতেই গিয়েছিলাম। হৈ-হল্লা, নাচ, গান। বড়পূজারীটা এতো মদ খাওয়ালো আমাকে! কোনো হুঁশই ছিলো না। কোমরের থলি থেকে সব টাকা বের করে বড়পূজারী পালালো। অনেক টাকা। সব টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিলে।”

—“তোমার টাকা চুরি করলে?” বলি আমি।

—“তবে আর বলছি কি! তোরা বড্ডো বিশ্বাসঘাতক। বড়-পূজারীকে বড্ডো বিশ্বাস করেছিলাম, দোস্ত বলে ডেকেছিলাম। পরের বছর ডিব্রুগড়ের বাজারে ওকে দেখেছিলাম। সওদা করতে ডিব্রুগড় গিয়েছিলাম। পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলাম। ওকে দেখলাম। ধরতে পারলাম না। পালিয়ে গেলো। নেফার অরণ্য হলে, কাম্বুর জঙ্গল হলে ওকে ধরে মুণ্ডুটা ধড় থেকে টেনে আলগা করতাম।” কারত্ব টাইপোদিয়া দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। আক্রোশে সে ফুলছে। তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। কয়েকটা লাল পিঁপড়ে নিয়ে হাতের তেলোতে রেখে সে টিপে টিপে মারে। তারপর সেই প্রাণ-চমকানো হাসি। ও আমার দিকে তাকাতেই বুকটা কেঁপে ওঠে। মিসেস্ তরফদারের ভয় পাওয়ার কারণটা আমি সহজেই বুঝতে পারি।

॥ বারো ॥

কাম্বুর জঙ্গলে সে রাতটা চিরদিন মনে থাকবে। ভয়ঙ্কর, ভীষণ সে রাত। বিরাট বিরাট সব গাছ। প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়া নেই মোটেও। গাছের পাতা নড়ে না। ডালের ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড সব অজগর মোচড়াতে মোচড়াতে এগিয়ে যায়। ডোরাকাটা বাঘ

নিঃশব্দ চরণে ঘোরাফেরা করে। কাম্বুর জঙ্গলে সে রাত আমার মনে চিরদিনের জন্য স্থায়ী আসন পেতেছে। বাঁশের তৈরী কুঁড়েঘর। আমার সঙ্গে রয়েছে তরফদার আর কারহু টাইপোদিয়া। কারহু টাইপোদিয়ার চেপ্টা নাক, মঙ্গোলিয়ান ফিচার্স। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন অদ্ভুত। অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে ছাড়ে। আর ও যখন হাসে তখন সত্যি কেমন যেন ভয়-ভয় করে। ও অঞ্চলে কারহু টাইপোদিয়ার অসাধারণ প্রতিপত্তি। ট্রাইবদের লোকেরা ওকে সম্মান দেখায়, সমীহ করে চলে। কারহু টাইপোদিয়ার অনেক কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের ভাবটা আমার মনে অনেক বেশিমাত্রায় ছিলো। কারহু টাঁইপোদিয়ার বোধ হয় সেটা পছন্দ হয়নি, বিশেষ করে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বোধ করি তার মাথা হেঁট হয়েছিলো।

তাই সে আমাকে আর তরফদারকে কাম্বুর ভয়ঙ্কর অরণ্যে এনে হাজির করেছিলো। কাম্বুর অরণ্য নির্জন বাঁশের ঘরে এনে হাজির করেছিলো। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনবে আর তাই দেখার জন্যে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে। টাইপোদিয়া তার প্রতাপ, প্রতিপত্তি, শক্তির অবমাননা দেখতে রাজা নয়। সেই নির্জন প্রান্তরে আরো দু ব্যক্তিকে আনা হয়েছে। তারা হলো তোলো কাহু আর তার স্ত্রী। বাঁশের ঘরের পাশে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে একরাশ কাঠ। লতাপাতা পুড়ছে। খানিকটা স্থান সেই আগুনের আভায় আলোকিত হয়েছে। তোলো কাহুর স্ত্রী মাটিতে বসে রয়েছে। তাকে ধরে রয়েছে তোলো কাহু। তোলো কাহুরা পাঁচ ভাই। পাঁচ ভাই-এর ওই এক স্ত্রী। বিয়ে করেছে তোলো কাহু, কিন্তু অন্য চার ভাই-এর তার স্ত্রীর ওপর পুরো অধিকার। কিন্তু সমস্যাটা বিয়ের ব্যাপার নিয়ে নয়। মেয়েটি সম্প্রতি তোলো কাহুর একটা ভাই-এর সঙ্গে ঘন ঘন পালাচ্ছে। মেয়েটাকে শায়েস্তা করবার জন্যে এখানে সমস্ত রকম

আয়োজন করা হয়েছে। পূজো করে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মাদের এখানে আনা হবে।

তোলো কাত্থর পূর্বপুরুষদের আত্মারা এসে ওর স্ত্রীকে শায়েস্তা করবে। তোলো কাত্থর সেই পাজী ভাইটাকে শাস্তি দেবে। আত্মারা এক এক করে এসে কাম্বুর অরণ্যে জড়ো হবে। সিয়াং ডিভিসানের উত্তরে আলং। আলং সিয়াং ডিভিসানের হেড কোয়ার্টার্স। কাম্বু বনভূমির ওধারে অনেক জমি জরিপ হয়নি। তুর্গম, তুর্ভেদ্য। সভ্য জগৎ সেখানকার খবর পুরোপুরি রাখে না।

ম্যাজিসিয়ান্ ইবো মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আহ্বান করছে ওমা ইউকে। মাথায়, মুখে, দেহে ইবো মুঠো মুঠো ধুলোবালি ছড়াচ্ছে। ইবোই আত্মাদের আনবে। ইবো ঘন ঘন মন্ত্রপাঠ করছে। কাম্বুর জঙ্গলে সন্ধ্যেটা কিরকম অস্বস্তিকর। ইবো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওমা ইউকে ডাকছে। মন্ত্র পড়ে চারধারে চাল ছড়াচ্ছে। চাল ছড়াচ্ছে তোলো কাত্থ তার স্ত্রীর চারধারে। মাঝে মাঝে সে চীৎকার করে উঠছে— 'ইয়া', 'ইয়া,' ইয়া' !

তোলো কাত্থর পূর্বপুরুষদের আত্মাদের তৃপ্ত করতে হবে। একটা মিথোন কেটে তার রক্ত ইবো মাথায় মুখে মেখেছে। সে আপঙ্ খেয়েছে প্রচুর। সুরা-আধিক্যে চোখ তুটো তার রক্তিম। মৃত কুকুরের পেটে চাল পুরে রাখা হয়েছে। কুকুরটাকে আগুনে ঝলসিয়ে আত্মাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হবে। অতৃপ্ত আত্মারা নেমে আসবে কাম্বুর জঙ্গলে। আত্মার দল যারা সন্তান দেয়, আবার সন্তান কেড়ে নেয়। যারা জমিতে ফসল দেয়, আবার মাটি পুড়িয়ে খাক্ করে ছাড়ে। এরাই শিকারকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলে। তারপর ধীরে ধীরে রক্ত চুষে খায়।

—'ইয়া,' 'ইয়া,' 'ইয়া,' !' সে চীৎকারে কাম্বুর অরণ্য কেঁপে কেঁপে ওঠে। বাঘের দল বুঝি গর্জন করতে ভুলে গেছে। ফেউ আর শেয়ালের দল ভয় পেয়ে পালিয়েছে। চারদিকে আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে।

মিথোনের রক্ত মেখে ইবোর মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে শব্দ তুলে সরীসৃপেরা চলে যাচ্ছে। আগুনের তাপে বনভূমি উষ্ণ হয়ে উঠেছে। পশু, পাখী, সরীসৃপ সবাই কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অরণ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তারা পালিয়ে বাঁচতে চায়। ইবো সব পারে। আত্মারা শুধুমাত্র তার কথা শোনে। আর কারু কথা তারা শোনে না। গাছটা এতো জোরে দুলছে কেন? মেয়েটা মাটিতে পড়ে গড়াচ্ছে। তার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। তা হলে আত্মারা এসে ওর ওপর ভর করলো। তোলো কাদু থর থর করে কাঁপছে।

কারদু টাইপোদিয়া কিরকম বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছে। তার মুখে একটা পৈশাচিক হাসি। মনে হচ্ছিলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা বরফগলা জলের স্রোত নেমে যাচ্ছে। তরফদারও ভয় পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কাপম বাড়ু স্বপ্ন দেখলো যে সে শিকার করতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছে। ঘুম ভাঙতেই সে ছুটলো ইবোর কাছে। ইবোই তাকে বলে দিলো তার স্ত্রী খুব শীগগীর মারা যাবে। আর সত্যি তো সাপের কামড়ে তার স্ত্রী অল্পদিনের ভেতর মারা পড়লো।

ইবো ডাকছে জিমিকে। জিমি যে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। ইবো ডাকে ডাইনি পোলোকে। ডাইনি পোলো যে তাপ আর আলোর কর্তা। ইবো ডাকছে পিঙ্কু-পিন্টেকে। শস্যক্ষেত রক্ষা করবার ভার যার ওপর। ইবো ডাকছে চুতে গামতেকে। গৃহরক্ষার কর্তা চুতে গামতে। গৃহস্বামীকে সে সর্ব বিষয়ে রক্ষা করে। ইবো ঘন ঘন মন্ত্রপাঠ করছে। মেয়েটা থর থর করে কাঁপছে। তার পালাবার অধিকার নেই। পাঁচ ভাই-এর ওই এক স্ত্রী। যদিও তোলো কাদু মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, কিন্তু পাঁচ ভাই-এর সন্তান সে গর্ভে ধারণ করবে। অন্য ভাইদের বঞ্চিত করে এক ভাইকে সে প্রাধান্য দিতে পারে না। এ তার মস্ত বড়ো অপরাধ। আর এই অপরাধের বিচার করবে আত্মার দল। যাদের জন্যে বাঁশের ঘরের পাশে গাছের ডালে দড়ি বেঁধে মাংস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইবো হাত-পা তুলে নাচছে,

চেঁচাচ্ছে। ইয়াসী বা মৃতের আত্মা এসে মাংস নিয়ে যাবে। দড়ি টেনে মাংস ওপরে তুলবে আর সেই মাংস খেয়ে আত্মারা পরিতৃপ্ত হবে। সত্যি তো দড়িটা ওপরে একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে! আগুনের আলোতে দেখা যাচ্ছে দড়ি ওপরে একটু একটু করে উঠছে। উঠছে আর উঠছে। তাহলে নেমে এলো আত্মারা। সত্যি সত্যি নেমে এলো। আমি বিস্মিত বিমূঢ়। তরফদারের মুখে কথা নেই। মেয়েটা গোঙাচ্ছে, তার মুখ থেকে ফেনা গড়াচ্ছে। ইবো পাগলের মতো নাচছে। চীৎকার করছে—'ইয়া', 'ইয়া', 'ইয়া'। কারহু টাইপো-দিয়ার জন্য ঘুরে তাকালাম। তাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। কোথায় টাইপোদিয়া? তরফদার চীৎকার করে টাইপোদিয়ার নাম ধরে ডাকতে থাকে। না, নেই সে। আশেপাশে কোথাও সে নেই। হঠাৎ একটা গগনভেদী চীৎকার। আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডালের ওপর একটা হুটোপুটির শব্দ। আমরা কিছু বুঝবার আগেই ধপাস্ করে একটা কিছু মাটিতে এসে পড়ে। আমরা দুজনে এগিয়ে যাই। এ কি! কারহু টাইপোদিয়ার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। হাত আর গলায় গভীর ক্ষতের চিহ্ন। ভীষণভাবে রক্ত ঝরছে। ওমা ইউ দড়ির মাংস ছেড়ে কাহুর টাইপোদিয়াকে ধরলে শেষ পর্যন্ত। গাছ থেকে চিতেবাঘটার নেমে যাওয়া তরফদারের চোখ এড়ায়নি। ইবো তখনো মাতাল। আপঙ্ খেয়ে সে টলছে আর 'ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' করে ক্রমাগত চীৎকার করে চলেছে। কাম্বুর জঙ্গলে কারহু টাইপোদিয়া আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। সে আর আত্মাদের পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করবে না। সে বোধ করি এতক্ষণে মৃত আত্মীয়দের আত্মার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে।

॥ তেরো ॥

ওমি ময়াং আর নেনী ময়াং-এর দিনগুলো ভালোই কাটছিলো। শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন। তুরাকরণের জলে নেনী ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়ে দেয়। জল ছল্‌কে ওঠে। ওমির ধমনীর রক্ত দ্রুত হয়। তুরাকরণের জলে প্রবল স্রোত। মাঝে মাঝে ঘূর্ণী রয়েছে। কিছু পড়ামাত্র চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তুরাকরণ, লিম্বুকরণ, সির্‌কি, শিওকরণ। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। পার্বত্য স্রোতস্বিনী। বৃষ্টি আর বরফগলা জলে পুষ্ট। এরা ঘন অরণ্যানীর ভেতর দিয়ে বয়ে এসেছে। দুদিকে ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম। এরা এক-একটি তরুণী, দেহভরা যৌবন। এদের চঞ্চলতা, অস্থিরতা নেনীর মনে আবেশ আনে। সিয়াং কিন্তু ঠিক উল্টো। সিয়াং বিরাট কিন্তু প্রৌঢ়া। সিয়াং আজ কেমন যেন শান্ত আর ক্লান্ত। যৌবনের সেই জয়-উল্লাস নেই। সেই প্রবল ভূমিকম্পের পর সিয়াং কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে। মিইয়ে গেছে। ভূমিকম্পের সময় একটা বিরাট পাহাড়ের চূড়ো ভেঙ্গে সিয়াং-এর ওপর পড়ে জলের গতি রুদ্ধ করছে। চলতে চলতে সিয়াং বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। এক দিকে জল বাধা পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু অন্য দিকটা শুকিয়ে গেছে।

সিয়াং ক্রমশঃ ক্ষীণকায়া হয়ে যাচ্ছে। ওমি বলে—"তুই সিয়াংকে শুষে নিয়ে নিজের যৌবনকে বাড়িয়ে চলেছিস।"

নেনী হেসে জবাব দেয়—"কি যা তা বলিস! ও কি আমার সতীন?"

—"ঠিক তাই। তোকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।" বলে ওমি।

—"ওপেট্‌ ময়াং-এর চেয়ে বেশী?" বলে নেনী। নেনী প্রতিশোধ নেয়। একটু আগে ওমি যা বলেছিলো তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয় নেনী।

কথাটা ওমির মনে খচ্‌ করে বেঁধে। ওপেট্‌ ময়াংকে পাবার

জন্যে ওমি অনেক চেষ্টা করেছিলো। ওপেট্ ওমির কাছে ধরা দেয়নি। নেনী সব জেনেছে।

—"ওসব পুরোনো কথা এনে মনে ঘা দিসনে নেনী। সর্দারের ঘর থেকে তোকে কে তুলে এনেছিলো? মাটি যখন ঘন ঘন নাড়া দিচ্ছিলো আর তুই যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলি? এতো অল্পদিনেই সব ভুলে গেলি? কাগোলী জামোর ঘরে যাওয়া নিয়ে আমি কখনো তোকে কিছু বলেছি?" বলে ওমি। প্রকাণ্ড এবং জঁাদরেল হনুমান-গুলো এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফঝাঁপ দেয়। দু-চারটে পাকা বুনো ফল নেনী আর ওমির দিকে ছুঁড়ে দেয়।

—"পাহাড় চাপা পড়ে সিয়াং ঝিমিয়ে পড়লেও ওর সাথে লিম্বুকরণ আর দুরাকরণের কোনো তুলনা হয় না। যেমন হয় না আমার সঙ্গে ওপেটের। তাই না?" প্রশ্ন করে নেনী।

—"তোর দেখছি বড্ডো গর্ব।"

নেনী হাসে। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। কি একটা গাছের পাতা ঘষে ঘষে দাঁতগুলোকে সে পরিষ্কার করেছে। খুব কাছে একটা অজগর একটা কাঠবিড়ালীকে গিলছে। কাঠবিড়ালীর অর্ধেকটা অজগরের মুখের ভেতর চলে গেছে। ওর মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কাঠবিড়ালীটার কি প্রবল চেষ্টা। নেনী একসময় ওমির গলা জড়িয়ে ধরে। বলে—"জানিস, সিয়াং-এ কাল স্নান করতে গিয়েছিলাম। বালুতে সাবধানে পা রেখে রেখে এগুচ্ছিলাম। কি জানি বলা তো যায় না। জায়গায় জায়গায় চোরাবালি। তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা। হঠাৎ এক জায়গায় দেখি বালু চিক্‌চিক্ করছে।"

—"বালুতে সোনা!" বলে ওমি।

—"ঠিক তাই। কিন্তু তুই জানলি কি করে?" প্রশ্ন করে নেনী।

—"আমার ঠাকুরদা একবার ওরকম দেখেছিলো। তার মুখে সব শুনেছি।"

—"তুই কি করলি ?" ওমি নেনীকে প্রশ্ন করে।

—"মুঠোমুঠো বালু উঠিয়ে গা-হাত, পা-মাথায় ছড়িয়েছি। সারা শরীর চিক্‌মিক্ করেছে। এর ওপর সূর্যের আলো পড়ে রঙের হাট বসিয়েছিলো।" বলে নেনী।

—"আমাকে নিয়ে যাবি ?" বলে ওমি।

—"না। তোর লোভ হবে। ও জায়গার খোঁজ তোকে দেবো না। তোর লোভ হলে তুই গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সবাইকে খবর দিবি। লোকজন এসে সব মজা নষ্ট করে দেবে। সব বালু কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। সিয়াং-এর রাগ হবে। জানিস, আরো একটা জিনিস দেখেছি !" বলে নেনী।

—"কি রে ?" জিজ্ঞেস করে ওমি।

—"বাঘের পায়ের ছাপ। মা-বাপের সঙ্গে চারটে বাচ্চাও ছিলো। পায়ের ছাপ দেখে তাই মনে হলো। আজ আবার যাবো। যদি একটা বাচ্চাকে তুলে নিয়ে আসতে পারি।" নেনী বেশ সহজভাবে বলে।

—"সর্বনাশ ! ও কাজ করতে যাস্ নে নেনী। ফল ভালো হবে না।"

—"তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুই তীরধনুক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। তোর তীরে যে রকম বিষ মাখানো থাকে, আমার ভয়টা কিসের ?"

—"চলোং পূজোর তোড়জোড় কেমন চলেছে রে ?" ওমি প্রশ্ন করে।

—"খুব জোর আয়োজন চলেছে। ছটি মেয়েকে নাচতে হবে। তার ভেতর আমি রয়েছি। মারিয়াং গ্রাম থেকে মিরি আসছে। এরকম মিরি আমাদের গাঁয়ে এর আগে আর আসেনি। এমন ভালো গায় আর নাচে। মিরির চারদিকে আমাদের নাচতে হবে।"

—"দেখিস মিরির সঙ্গে যেন বেশী ঢলাঢলি করিস নে।" ওমি নেনীকে বোঝায়।

—"না, না, তোর ভয় নেই। ভালো করে না নাচলে ছ'জনের ভেতর থেকে মিরি আমাকে কেন বেছে নেবে? আর জানিস তো, ছ'জনের ভেতর আমাকে বেছে না নিলে তোর পরাজয়। তুই ভাবতে পারিস, তোর নেনী পিছিয়ে থাকবে?"

—"সেটা ঠিক কথা। নাচে তোর খুব ভালো করা চাই। আচ্ছা শোন্, এবারকার গানের বিষয়বস্তুটা আমাকে খানিকটা শোনাবি?" বলে ওমি।

—"এই জগৎটা নিয়ে মানুষ আর শয়তানের ভেতর প্রতিযোগিতা হলো। পৃথিবীটা কার দখলে থাকবে? শয়তান মানুষের কাছে হেরে জঙ্গলে পালিয়ে গেলো।" নেনী গানের সারমর্ম বুঝিয়ে বলে।

—"কাল পাশিঘাটে সওদা পিঠে করে নিয়ে গিয়েছিলি?" প্রশ্ন করে ওমি।

—"গিয়েছিলাম।" জবাব দেয় নেনী।

—"কি কি বস্তু নিয়ে গিয়েছিলি?"

—"মরিচ, ডিম, সাপের চামড়া আর হরিণের শিং।"

—"সব বিক্রী হয়ে গেলো?"

—"সব।"

—"কে কিনলে?" ওমি প্রশ্ন করে। তার মনে একটা প্রশ্ন অনবরত ঘোরাফেরা করছে।

—"পলিটিক্যাল অফিসের বাবু সব কিনে নিলে।" জবাব দেয় নেনী।

—"ও।" ওমির মুখ গম্ভীর হয়। "ওর কাছে বেচতে গেলি কেন? তোকে না এতো করে ওর কাছে যেতে বারণ করলাম?" ওমির মনে সন্দেহটা ভালো করে দানা বেঁধেছে।

—"গেলে দোষটা কোথায়? বড্ডো ভালো দাম দেয়।" জবাব দেয় নেনী।

—"দাম না হাতী। ও তোকে মরম করতে চায়। ভালোবাসার

বাঁধনে জড়াতে চায়। আর তোর ভালোবাসা কুড়োতে ভালো লাগে।"

—"ধেৎ, তোর যতো বাজে বকুনি!" মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে নেনী।—"কি যে তুই বলিস?" বলে নেনী।

—"আমি ঠিক বলেছি। ওর সঙ্গে ধেমালি (ঠাট্টা-মস্করা) করিস নে। লোকটা ভালো নয়। ওর মতলব খারাপ বলে মনে হয়।"

—"ছ্যাখ্, জাওলাপ্রসাদের দোকান থেকে কেমন একটা চকচকে জামা কিনেছি।" নেনী বেতের ঝুড়ি থেকে জামাটা বের করতে চেষ্টা করে। ঝুড়ির ভেতর অনেক জিনিসপত্তর। শুকনো মাছ, তামাক, পান, সুপুরি, লতাপাতা আরো অনেক কিছু।

—"ছ্যাখ্ নেনী, জাওলাপ্রসাদের সঙ্গে পলিটিক্যাল অফিসের বাবুর যোগ রয়েছে। দেখছিস না জাওলাপ্রসাদের দোকানে কতো রকমের জিনিসপত্তর। আর আমাদের ওরাং বাটু কিছুই যোগাড় করতে পারে না। ওই বাবু জাওলাপ্রসাদকে সমস্ত রকম সুখসুবিধে আর নানারকম বন্দোবস্ত করে দেয়। সব বাবুর কারসাজি।" বলে ওমি।

—"জানিস, বাবু আমাকে ডিব্রুগড়ে নিয়ে যেতে চায়। সেখান থেকে জোড়হাটে যাবো। তারপর শিলং। আমাকে বাইস্কোপ দেখাবে। জামাকাপড় দেবে বলেছে।"

—"সর্বনাশ। ভালো হবে না নেনী। ওর সঙ্গে গেলে, ভালো হবে না। অপদেবতাকে আমি ডাকবো। তোর নৌকো তখন ব্রহ্ম-পুত্রের জলে ওলটাবে।" ওমি উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—"পলিটিক্যাল অফিসের বাবুর গায়ের রংটা এরকম টক্‌টকে লাল কেন রে?" প্রশ্ন করে নেনী।

—"সর্বনাশ! পিশাচী মরেছে! কখনো তুই আর পাশিঘাটে যাবিনে। সওদা নিয়ে কখনোও বাবুর কাছে যাবিনে। বাবুর দেহটা লাল, মনটা কালো।" বলে ওমি।

—"বেশ যাবো না।"

হঠাৎ নেনী উঠে ছুট্ লাগায়। ওমি পেছন পেছন দৌড়ায়। কিন্তু পাথরের ওপর পা হড়কে একেবারে লিম্বুকরণের জলে। নেনী হেসে গড়িয়ে পড়ে।

*　　　*　　　*　　　*

পাশিঘাট এয়ার-ফিলডের খুব কাছেই সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। গ্রাম্য সার্কাস। আসামের কোনো ছোট্ট শহর থেকে এ সার্কাস-পার্টি এসেছে। ওদের সঙ্গে সাজসরঞ্জাম যা এসেছে তা অতি নগণ্য। লোকজন মাত্র জনকয়েক। খেলা দেখাবার জিনিসপত্রের সাংঘাতিক অভাব। ছুটো ছাগল, একটা বানর, একটা গাধা, ছুটো রং-ওঠা বাইসাইকেল মাত্র সম্বল। হ্যাজাক্ জ্বালিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, ঢোল, টিন পিটিয়ে ওরা দর্শকদের আহ্বান জানায়। ছেঁড়া তাঁবু। তাঁবুর জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। তবু পাশিঘাটে এর কদর আছে। কদর আছে নেফার অরণ্যে। কয়েকটা বাঁশের সাহায্যে তাঁবুটাকে কোনোরকমে দাঁড় করানো হয়েছে। ভেতরে স্থানাভাব, দর্শকরা মাটিতে বসেই খেলা দেখে। দলে পুরুষ ছাড়া একটি মেয়েও রয়েছে। নাম লছমী। লছমী আঁটো পায়জামা পরে, কাঁচুলি এঁটে, সোনালী আর রূপালী সুতোয় কাজ করা জ্যাকেট গায়ে চড়িয়ে আসরে এসে নামে। ডাগর ছুটো চোখে কাজল টেনে, পাউডার আর ক্রীমে মুখখানা ফরসা করে, কপালে কুমকুমের টিপ এঁকে লছমী এসে দর্শকদের সামনে দাঁড়ায়। তাঁবুর বাইরে তখন ঢোল, বাঁশী, করতালের ঐকতান শুরু হয়। দর্শকরা স্ত্রী আর পুরুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ওদের দেহে বস্ত্রাভাব। পুরুষদের শুধু নেংটি সম্বল। মেয়েদের পিঠে ন্যাকড়ার ফালি বা বেত দিয়ে বাচ্চারা বাঁধা রয়েছে।

জঙ্গলের পথে বহুদূর থেকে তারা এসেছে। এসেছে দলে দলে। পাদম্, পাশি, পাঙ্গিন্ আর টাগিন্ ট্রাইবস্-এর লোকজন। ইয়াংবু, পাঙ্গিন্ মেবো থেকে ওরা এসেছে। এসেছে স্ত্রীর পিঠে বাচ্চা চড়িয়ে, নিজেদের কোমরে চক্‌চকে দা ঝুলিয়ে। শুকনো ভাত আর শুঁটকো মাছ থলেতে

পুরে ওরা এসেছে। অনেকেরই হাতে-মুখে উল্কি আঁকা, লছমী যখন আঁটোসাটো জামা আর পাজামা পরে হাতে ছাতা নিয়ে তারের ওপর দিয়ে হাঁটে, লছমী যখন এক চাকার সাইকেল চালায়, কাজলটানা দীঘল চোখে এদিক ওদিক দৃষ্টি হানে, হিন্দী ছবির গান গেয়ে কোমর নাচায়, নানারকম ঢঙের আশ্রয় নেয়, চটুলতা আর চপলতাকে প্রশ্রয় দেয়, আর পুরুষগুলোর কথামত ছাগলটা যখন জ্বলন্ত লোহার রিং-এর ভেতর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যাতায়াত করে, পদম্, পাশি, টাগিন্-ট্রাইবস-এর লোকগুলোর চোখে তখন রাজ্যের বিস্ময় নেমে আসে। তাদের আশ আর মেটে না। ছোট ছোট চোখ। চেপ্টা নাক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। মুখে-হাতে উল্কি আঁকা। পোকায় খাওয়া আর পানে লাল হওয়া দাঁতগুলো বের করে তারা হাসে। তারা খুশিতে ভরে ওঠে। লছমী সুন্দরী। সত্যি সুন্দরী। এ কোন্ জগৎ। এ কোথাকার মেয়ে। কি সুন্দর এর সাজসজ্জা। অদ্ভুত এর চলাফেরা, চাউনি আর হাসি। নেফার অরণ্য থেকে এ জগৎ কতো স্বতন্ত্র। পাশিঘাটের গ্রাম্য সার্কাস ওদের মনে রামধনুকের রঙের পরশ বুলায়। চোখে নামিয়ে আনে স্বপ্নের মায়াজাল। নেফার অরণ্যে এ কোন্ জগতের এরা সৃষ্টি করলে!

নেপালী বস্তীতে যাবার পথে জঙ্গলের পাশেই সার্কাসের লোকেরা থাকবার জন্যে তাঁবু ফেলেছে। জায়গাটা কয়েকদিনের মধ্যেই তারা নোংরা আর অপরিষ্কার করে তুলেছে। ছেঁড়া চট, হাঁড়িকুড়ি, টিনের ভাঙ্গা তোরঙ্গ। জলকাদায় চতুর্দিক থৈ-থৈ করছে। জলের রং কালো। তার ওপর পোকা উড়ছে। আশেপাশে কয়েকটা শুয়োর ঘুরছে। দুটো বাচ্চা নিয়ে মা একরাশ কাদার ভেতর পরম তৃপ্তিতে অবগাহন করছে। দিনের আলোতে লছমীকে চেনা যায় না। কোথায় অদৃশ্য হয়েছে রাতের কাজল, পাউডার আর স্নো। কালো মেয়েটা একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে একরাশ হাঁড়িকুড়ি নিয়ে মাজাঘষায় ব্যস্ত। লছমী মাজাঘষা করছে। জল তুলছে। বাটনা বাটছে। উনুন

ধরাচ্ছে। পুরুষগুলো বেশী রাত অবধি মদ খেয়েছে। গাঁজা টেনেছে। হাত-পা ছড়িয়ে তাঁবুর ভেতর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁবুর ভেতরটা কি অসম্ভব রকম নোংরা! মদের বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। বিড়ি আর সস্তা সিগারেটের টুকরো রাশি রাশি ছড়িয়ে আছে। দুটো জোয়ান ছোকরা, একজন প্রৌঢ়। একটি ছেলে আর প্রৌঢ় জাতিতে মুসলমান। লছমী আর অন্য ছেলেটি হিন্দু। প্রৌঢ় ওদের সঙ্গে সুরাপান করেছে। পান করে বমি করেছে। বমির ওপর ভন্‌ভন্‌ করে মাছি উড়ছে। বমির আশেপাশে জমিটা লাল। গালভর্তি পান খেয়ে সারারাত পিক্‌ ফেলেছে ওরা। তবলা আর বাঁয়া মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। হারমোনিয়ামটা তাঁবুর এক কোণে রয়েছে। জমির ওপর ঘুঙুরজোড়া পড়ে আছে। লছমী সারারাত গান করেছে আর নেচেছে। দিল্‌ দেওয়া-নেওয়ার গান। সার্কাসের কঠিন পরিশ্রমের পর ওরা গানবাজনা করে। মদ খায়। নাচে। ছোকরা, প্রৌঢ় সবাই লছমীর সঙ্গে প্রেম করে। এক নারী। তিনটি পুরুষ। শহরে অনেক রকম আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু এখানে নেফার এ অরণ্যে তারা কি করে সময় কাটাবে? এখানে সিনেমা নেই। থিয়েটার নেই। জঙ্গল আর জঙ্গল। সিয়াং, টিরাপ, সুবনসিরি আর লোহিত। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জঙ্গলের পথে খচ্চরের পিঠে মাল চাপিয়ে আর নিজেরা পায়ে হেঁটে কাহাতক আর পারা যায়!

আজ সার্কাস-পার্টির ঐকতান বাদনে বিশেষত্ব রয়েছে। আজকের সুরটা সম্পূর্ণ নূতন। হ্যাজাকের আলো আজ অনেক জোরালো। বিকেল থেকেই সার্কাসের মানুষ আর জন্তুগুলোর মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়ে গেছে। তাদের যতোগুলো খেলা দেখাবার কথা তার ভেতর শ্রেষ্ঠ খেলাগুলোর মহড়া বারে বারে হচ্ছে। সার্কাসের লোকগুলো সাজসজ্জায় নিজেদের অনেক বেশী চক্‌চকে আর ঝকঝকে করে তুলেছে। চলাফেরায় তারা যেন আজ অনেক ক্ষিপ্র। অনেক নিপুণ। এসবের কারণ রয়েছে। আজ ডেপুটি কমিশনারের তাঁবুতে খেলা দেখতে

আসার কথা তার সঙ্গে এডুকেশন্, সি. পি. ডবলু. ডি, পলিটিক্যাল-মেডিক্যাল অফিসের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা থাকবে। ডি. সি-র সঙ্গে থাকবে সইকিয়া আর চক্রবর্তী। মোট কথা সমস্ত পাশিঘাটের গণ্যমান্য ব্যক্তির দল আজ সার্কাস-পার্টির তাঁবুতে সার্কাস দেখতে জমায়েত হবে। ডি. সি. সার্কাসের খেলা দেখে খুশি হলে পাশিঘাটে আর মেবোতে সার্কাস-পার্টির লোকদের থাকবার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারে। ডি. সি. চক্রবর্তীকে অর্ডার দেবে নূতন পাস ইস্যু করবার। সইকিয়াকে ডেকে বলে দেবে ওদের খেলার নূতন সাজসরঞ্জাম কিনে দেবার জন্যে। তার জন্যে সরকারী তহবিল থেকে কিছু গ্র্যাণ্টের বন্দোবস্ত হবে। চাই কি ওদের থাকবার জন্যে বাঁশের ঘরের বন্দোবস্তও হয়ে যেতে পারে। সব কিছু ডি. সি-র মর্জির ওপর নির্ভর করছে। অনেকটা তার খেয়াল-খুশির ওপর। আজ জীবনপণ করে খেলা দেখাতে হবে। সার্কাসের লোকগুলোর মনে আজ কতো আনন্দ। তাদের খেলা দেখতে সব বড়ো বড়ো আদমীরা আজ ভিড় জমাবে। তাদের বহু আর বিবি আসবে। আজ ঘামের বদ্খত্ গন্ধ নয়। ওরা পাউডার আর আতরের খুশ্‌বু ছড়াবে চারদিকে। তামাম পাশিঘাট জমায়েত হবে ওদের তাঁবুতে। খালি রঙ্ আর রোশনাই। দিলদরিয়া মানুষগুলোর দিল আর মেজাজ যদি খুশ্ থাকে, খুশ্ থাকে আশমানের চাঁদ আর সূরয, খোদা যদি মেহরবানি করে, দুটো মাস সময় যদি ওরা আরো বেশী পায়, তবে অন্য সার্কাস-পার্টি নেফাতে জমায়েত হবার আগেই ওরা তাগদ্ আর মেহনতের জোরে, বুকের খুন ঢেলে দিয়ে শুষে নেবে সারা পাশিঘাটের দৌলত। দুটো মশাল জ্বালিয়ে লছমী নিজেদের থাকবার তাঁবুতে বসে তার প্রসাধনপর্ব শেষ করছে।

আজকে হুরী কিংবা অপ্সরী সাজতে হবে। একটা ভাঙ্গা আয়না নিয়ে সে বসে গেছে। মুখখানার ওপর যতোরকম ভাবে কারুকার্য করা যায়, কিছুই সে অসম্পূর্ণ রাখবে না। মশালের আলোতে তাঁবুর ভেতর আর কতোটা আলোকিত হয়! বাইরে সম্পূর্ণ অন্ধকার।

দূরে সার্কাসের তাঁবুতে ঢোল, বাঁশী, করতাল বাজছে। লছমীর দেহে রয়েছে শুধু ব্রেসিয়ার। দেহ থেকে সমস্ত জামাকাপড় একে একে খুলে সে নিজেকে মুক্ত করেছে। বাকী ছিলো ওই ব্রেসিয়ার। এবার একটানে ব্রেসিয়ারটা খুলে সে দূরে ছুঁড়ে দেয়। বস্ত্রহীন ও তেলমাখানো দেহটা মশালের আলোতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ঋজু, মসৃণ, কোমল, অপূর্ব সুষমামণ্ডিত দেহখানা আলো-অন্ধকারের ভেতর এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মনে হয় এক শিল্পী তাল তাল অন্ধকারের ভেতর থেকে কুঁদে এই মূর্তি বের করে এনেছে। আর তার সৃষ্টির ওপর এধার আর ওধার থেকে হেনেছে আলোর ছটা।

তাঁবুর ছেঁড়া অংশে চোখ লাগিয়ে আকণ্ঠ সুধাপান করে এক নারী। এ চোখের অধিকারিণী অন্য এক নারী। হোক সে নারী, তবুও ক্ষণকালের জন্য এ নারী দেখে অন্য নারীকে। পান করে অন্য এক নারীর রূপসুধা। যা সুন্দর তা সব সময়ই সুন্দর। সবাইকার কাছে সুন্দর। নেনী ময়াং ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যায় যে সে নারী। নেনী যে উদ্দেশ্যে আজ রাতে চুপিচুপি এখানে এসে'ছ তা বুঝি ক্ষণকালের জন্য সে ভুলে যায়। সে নিজে নারী। কিন্তু বস্ত্রহীন এ দেহের সঙ্গে তার দেহের কতো প্রভেদ। এ দেহ নয়। মেঘের কোলে বিজলী। এ কালনাগিনীর দেহ। কালনাগিনী যেমন পাক খেয়ে খেয়ে বৃক্ষশাখে উঠতে থাকে, এ দেহ তেমনি ভাবে পাক খেতে খেতে পুরুষের দেহ জড়িয়ে ধরবে। আর পুরুষ হয়ে যাবে অবশ আর বিহ্বল। নিজেকে মুক্ত করবার সমস্ত শক্তি সে হারিয়ে ফেলবে। লছমী সার্কাসের তাঁবুতে চলে গেলে এখানে কেউ থাকবে না। এ তাঁবু পড়ে থাকবে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। সার্কাসের লোকগুলো যখন খেলা দেখাবে, লছমী যখন তার কটাক্ষ আর দেহসৌন্দর্যে দর্শকদের ধমনীর রক্ত চঞ্চল করে তুলবে তখুনি শুরু হবে নেনীর কাজ। এ তাঁবুতে ছড়ানো সায়া, শেমিজ, ব্লাউজ আর ওই বক্ষবন্ধনী তুলে নিয়ে নেনী পালাবে। ওই বক্ষবন্ধনীর ওপর তার প্রচণ্ড লোভ। ও

জিনিস শরীরে চাপিয়ে চলতে কেমন লাগবে কে জানে। সে দ্রুত হাঁটা-চলা করতে পারবে তো? এর আগে অনেকদিন প্রচুর কৌতূহল নিয়ে সে লছমীকে লক্ষ্য করেছে। সার্কেল অফিসার খুশী হবে তো? সমস্ত কিছু যোগাড় করে সে সাজতে বসবে। ঠিক যেমন করে লছমী সাজে। কুমকুমের ফোঁটা, কাজল, পাউডার, স্নো, ক্রীম—কোন কিছুরই নাম সে জানে না। কিন্তু তাঁবুর ছেঁড়া অংশে চোখ লাগিয়ে দু-তিনদিন ধরে সে লছমীকে লক্ষ্য করেছে। লছমী ঠিক যেমন ভাবে সাজে ঠিক তেমনি ভাবে সে সাজবে। আজ রাতে নেনী ঠিক ওইরকম ভাবেই সাজবে। লছমী আর একটি মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। সার্কাসে খেলা দেখাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। লছমীর সাজসজ্জাও শেষ। এবার সে বেরিয়ে পড়বে। মশাল দুটো জ্বলুক। দুটি রমণীর অন্তঃকরণও জ্বলছে। লছমী কি পারবে পাশিঘাটের ওপরমহলের কাউকে আজ রাত্রিতে ঘায়েল করতে? নেনীর জন্যে অপেক্ষা করছে সার্কেল অফিসার। ডিব্রুগড় আর শিলং-এ নাকি অনেক কিছু দেখবার রয়েছে। ওমি ময়াং রয়েছে সার্কাসের তাঁবুতে। আজ ওখানে ভালো ভালো খেলা দেখানো হবে।

নেনীর সাজসজ্জা দেখে সার্কেল অফিসার হতবাক্! বিস্মিত! বিমূঢ়! নেনীকে ওরকম সাজসজ্জায় চেনা মুশকিল। সে পরী সেজে এসেছে। লছমীকে অনুকরণ করে সে নিজেকে সাজিয়েছে। সার্কেল অফিসারের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। সে সার্কাস দেখতে যায়নি। মদের বোতল নিয়ে নেনীর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। নেনী এরকম ভাবে সেজে আসবে এ ছিলো তার কল্পনার বাইরে। দূরে ঢোল, করতাল, বাঁশী বাজছে। সার্কাসের খেলা চলছে। হাততালি পড়ছে ঘন ঘন। ওমি ময়াং একমনে সার্কাসের খেলা দেখছে।

হঠাৎ। হ্যাঁ, হঠাৎ। সিয়াং-এর ওপর যে পাহাড়টা হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছিলো, সেই বাধাকে এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস

এসে মুহূর্তে দূরে ঠেলে ফেলে দেয়। এক বিরাট জলস্রোত এসে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শান্ত-নিস্তব্ধ সিয়াং এক ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে চলে। সামনে যা পায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতোদিনের সঞ্চিত চাপা আক্রোশ যেন গর্জে উঠেছে। সিয়াং কোনো বাধা, বন্ধন, বিধিনিষেধ মানবে না। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সিয়াং-এর তীরের বাংলোগুলো মুহূর্তে জলের তলায় তলিয়ে যায়। কাঠ, লোহা, পেরেক, টেবিল, চেয়ার, খাট আর অন্যান্য জিনিসপত্র সিয়াং-এর জলে নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। সিয়াং আর প্রৌঢ়া নয়। সে আবার যুবতী হয়েছে। সে যৌবন ফিরে পেয়েছে। সে নাচছে, গর্জন করছে। ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। বাংলোর মানুষগুলো নিস্তাব পায় না। জলের তোড়ে তারা কোথায় ভেসে যায়। হারিয়ে যায়। নেনী আর সার্কেল অফিসারকে এ জলস্রোত কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা কেউ জানে না। ক্রুদ্ধ সিয়াং নেনী ময়াং আর সার্কেল অফিসারকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এ অনাচাব সে সহ্য করবে না। কোনোদিনই করেনি। সিয়াং শুধু নদী নয়। সিয়াং আদিদের দেবতা। আদিরা ওকে বড়ো শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। পূজো দেয়। মানত করে। সিয়াং নদীর কথা না ভেবে নেফার কথা ভাবা যায় না। নেফা আর সিয়াং এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে। ওমি ময়াং সেদিনও মুরগী কেটে তার রক্ত সিয়াং-এর জলে ঢেলেছে। সিয়াং-এর আশীর্বাদ চেয়েছে। এই মুহূর্তে ওমি সার্কাসের তাঁবুতে বসে খেলা দেখছে। সিয়াং অনাচার, অত্যাচার সহ্য করে না।

বেশ কয়েক বছর হলো নেফা ছেড়ে চলে এসেছি। জানিনে আজ নেফার কতোটা পরিবর্তন হয়েছে। কতোটা সে বদলিয়েছে। আশা করছি নেফা দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। নেফা আমার মনে স্থায়ী আসন পেতেছে।

॥ শেষ ॥